"উত্তর আকাশ" ধারাবাহিকভাবে মাসিক "নতুন সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে বের করবার সময় এখানে ওখানে কিছু কিছু যোগ করেছি। আমার ছোট মাসি শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্তী ও বন্ধু শ্রীমুকুল ভট্টাচার্য তবার পাণ্ডুলিপিটি কপি করে দিয়েছেন। কবিবন্ধু শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও "নতুন সাহিত্য" সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার সিংহের উৎসাহ ছাড়া বইটি লেখা ও ছাপা হতো কি না সন্দেহ।

তাঁদের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

শিলঙ
পনেরোই জুন, ১৯৫৭।

বনমালী গোস্বামী

প্রিয় বন্ধু

শ্রীসুধীরবিজয় সেনগুপ্তকে

"...যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাইনি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।"

—রবীন্দ্রনাথ

"Words are like leaves, and where they most abound,
Much fruit of sense beneath is rarely found."

—Pope, Essay on Criticism, II.

এক

চেহারা আমার বরাবরই খুব ভাল। যেমন বুকের ছাতি, তেমনি খাঁদা নাক আর কুতকুতে চোখ. সরু লিকলিকে কণ্ঠা জাগা গলা। তবু ভরসা ছিল একদৃষ্টিতে সবাই আমায় বাঙালী বলে চিনে নেবে! ভুল ভাঙাল প্রথম ইস্কুলের অ্যা. হেডমাস্টার। একপাল ছেলের সামনে সটান শুধিয়ে বসলেন একদিন : আর ইউ এ নেপালী?

মর্মাহত হলাম খুবই। বিদেশীর ভ্রান্তি বলে সান্ত্বনায় মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। কিন্তু বছর কয়েক পরে গেছি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে অফিসে দেখা করতে। দাঁড়িয়ে আছি বারান্দার সিঁড়ির পাশে। হঠাৎ সোরগোল উঠল : মিস্ত্রি এসেছে। বুঝলাম বাড়িটির বিজলীর তারে গণ্ডগোল বেধেছে, মিস্ত্রির অপেক্ষা করছে সবাই। মিনিট কয়েক বাদেই হন্তদন্ত বড়বাবু বারান্দায় বেরিয়ে এসেই পাকড়াও করলেন আমাকে : এতনা দেরী কাহে? হাঁ, শীগগির লাই. ঠিক করে দাও। -প্রাণটা মোচড় দিয়ে উঠলেও সস্মিত মুখে নীরবে আঙুল তুলে আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম ডান ধারের লাইট পোস্টটার দিকে। মোটা সোটা বিহারী মিস্ত্রিটি হাফপ্যান্ট পরে শাখামৃগের মত স্বচ্ছন্দ-গতিতে তরতর করে পোস্ট বেয়ে উপরে উঠছিল। ঠিক তক্ষুনি আমার পরিচিত ভদ্রলোকও এসে হাজির। ব্যাপার বুঝে বড়বাবু জিব কেটে লজ্জায় জড়োসড়ো।

আরো আছে। একদিন এক সিনেমা হলের গ্যালারির দরজার পাশে টিকিট হাতে নিয়ে উধাও গেটকিপারের আশায় দাঁড়িয়ে আছি।

হৈ হৈ করে ছুটে এলেন এক ভদ্রলোক। একটা টিকিট মুহূর্তে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। হা হতোস্মি। সিনেমা দেখতে এসে গেটকিপার বনে গেলাম?

এক মণিপুরী ভদ্রলোক আমাকে একদিন এক অফিসে পেয়ে মণিপুরী ভাষায় খুব কষে দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে জবাবের প্রত্যাশায় চোখে চোখ রাখলেন। বুঝলাম, আমার বিচিত্র চেহারা আবার তার "খেল" শুরু করেছে। নিবিড় অপত্য স্নেহে আমার চোখে মুখে আলতো হাত বুলিয়ে বাংলায় বললাম: আমার নাম এই, আমার বাড়ি অমুক জিলায়।

—উঃ।—মস্ত জিব কেটে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক।

—আহা হা, মাপ করুন। আমার দেশের এক ছোকরা সাত বছর আগে ত্রিশ টাকা ধার নিয়েছিল। আমি ভাবছিলাম—আঃ, দেখুন দেখি।

তীব্র আফশোষে ভদ্রলোক আমার পিঠ চাপড়ে 'দাদারে, ভাইরে' বলে কাৎরাতে শুরু করলেন। কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম তখনো তাঁর ছোট দুটি চোখে গাঢ় সন্দেহের ছায়া জমাট বাঁধা।

এমন যার বহুরূপী চেহারা তার মনে একটা দুঃখ থাকবেই। বামনদের যেমন থাকে কিংবা ট্যারা, খোঁড়া, নেড়াদের। কিন্তু সব কিছুরই ভাল মন্দ সুবিধা অসুবিধা রয়েছে। তাই সেদিন বহুদর্শী শ্রদ্ধেয় একবন্ধু বললেন: ভারতকে দেখতে চাও? তবে আর দশজনের মত টাকা খরচ করে দেশের শতকরা দশভাগ লোকের ছবি দেখতে বেরিও না। বাকি নব্বই ভাগ, যারা খাঁটি ভারতবাসী, তাদের দেখতে হলে থার্ড ক্লাশ ট্রেনে চড়ে তাদেরই একজন হয়ে বেরিয়ে পড়। যদি তা হতে পার, ওদের জানবে, ভারতের শাশ্বত আত্মার স্পন্দন বুক ভরে উপলব্ধি করতে পারবে। আর যদি চশমা চোখে সার্জ গায়ে

পাইপ টেনে ওদের জানতে যাও, টুপ করে কচ্ছপের মত ওরা গলা ভিতরে টেনে নেবে, মেরে ফেললেও ওদের অন্তরের কথা জানতে পারবে না কোনদিন। আমি দেখেছি, এই যারা শতকরা নব্বই ভাগের দলে পড়ে, প্রতিদিন তারা হাজারে হাজারে থার্ড ক্লাশ ট্রেনের কামরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারতকে জানতে চাও তো এদের জানো আগে—

শ্রদ্ধেয় বন্ধুটি আবেগ প্রবণ। কাঁপা গলায় তার ভারত কথা শেষ করে তিনি খুঁটিয়ে আমার মুখে তাকাতে লাগলেন। ইঙ্গিত বুঝলাম। এতদিনে আমার বিচিত্র এই বহুরূপী চেহারার সুযোগ নেবার দিন এসেছে।

তাই বেরিয়ে পড়লাম। জানুয়ারির বরফ-ঝরা শীতের সকালে সূর্য জাগবার আগেই গাড়িতে চড়ে বসলাম। গায়ে কালো লোম-উঠা ওভার কোট, মাথায় লালচে ড্রাইভারি টুপি, গলায় জড়ানো কম্ফটার। সঙ্গে চটের থলি। ডিজেলের শক্তিশালী ইঞ্জিন বুনো শুয়োরের মত ককিয়ে উঠতেই তাকালাম শিলঙের দক্ষিণে আকাশ-ছোঁয়া পাইনঘেরা নীলাভ পাহাড়ের চূড়ায়—যেদিকে আমার বাড়ি।

—চলো সাথী, বান্ধো গাঠুরী, বহু দূরমে যানে হোগা—

দুধারে অনবরত মিলিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের সারি, ছায়া নিবিড় পাইন বন আর ক্ষীণস্রোতা ঝরণাধারা। আর মাঝে মাঝে প্রসারিত উপত্যকার বুকে পর্দার মত ঝুলন্ত বিরাট আস্বচ্ছ মেঘের মালা। অপূর্ব।

এবার আর পাহাড় বন নয়। চকচকে পালিশ ন্যাড়া টিলার সারি দুধারে দাঁড়িয়ে। প্রভাতী রোদ গায়ে পড়ে যেন খলখলিয়ে হাসছে। এক একটা টিলাকে মনে হয় যেন প্রকাণ্ড প্রাগৈতিহাসিক হাতির মতন, তার গায়ে কালো কালো ভাঁজ। কখনো বা টিলার পাশের গভীর খাদ থেকে পাকখেয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার মত উঠে আসছে পাতলা

মেঘের পুঞ্জ। আবার শুরু হল ঘন নিবিড় ছায়া ছায়া বন। রাস্তার গা ঘেঁসে নেমে যাওয়া গভীর খাদের সর্বাঙ্গ জুড়ে গাছগাছড়ার কোলাকুলি, অনেক নিচে বয়ে চলেছে অতি ক্ষীণ জলধারা! এর ওধারে আবার শুরু হয়েছে টিলাময় উপত্যকা, তার ওপারে প্রহরীর মত স্থির অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আকাশ-ছোঁয়া নীলাভ পাহাড়। সেদিকে তাকিয়ে তোমার মাথা ঘুরবে, দিক্ দিশা হারিয়ে ফেলবে তুমি! হঠাৎ বাচ্চাদের্ চেঁচামেচিতে চকিত হয়ে মুখ ফেরাবে তুমি। রাস্তার কিনারে রোদে দাঁড়িয়ে হাত তুলে গাড়ির লোককে ডাক্‌ছে একপাল পাহাড়ের সরলপ্রাণ ছেলেমেয়ে।

কিন্তু কী শীত। গাড়িটা মোড় ফিরতে মাঝে মাঝে যে তুএক ঝলক রোদ ভিতরে ঢুকে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি—

এতক্ষণে গাড়ির ভিতরে শুরু হয়েছে কণ্ঠের বিকৃত আওয়াজ—ওক্ ওক্—ওয়াক্!···সর্পিল গতিতে প্রকাণ্ড গাড়ি পাক খাচ্ছে উঁচু-নিচু রাস্তায়, প্রতিমুহূর্তে, মাথা ঘুরছে সবাইর, বমি করছে অনেকে। বীভৎস দৃশ্য! আমার সামনের সিটের মোটা-সোটা মাড়োয়ারিটি এতক্ষণ মাথা হেলিয়ে ঘুমাচ্ছিল, এবার জেগে উঠে হঠাৎ গলায় হেঁচ্‌কি টান তুলল একটা, তারপর স্প্রিং এর মত লাফ মেরে উঠল। তার শরীরটা আচম্বিতে বেঁকে গেল, মাথাটা ঠক করে গাড়ির চালে ঠেক্‌ল। তার পাশে বসা বুড়োটে বাঙালী ভদ্রলোক হাঁ হাঁ করে উঠলেন আতঙ্কে।—এ্যাঁ, একি, একি! -লোকটি তখনো সমানে হেঁচকি টানে শরীর বেঁকিয়ে মাথা ঠুক্‌ছে চালে! হৈ হৈ কাণ্ড। গাড়ি থামল। ড্রাইভার এগিয়ে এসে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলে। পিছনের দিকে টকটকে লালশাড়ি পরে বসেছে একটি মেয়ে, ঐ রঙ্ দেখে মৃগীরোগী ক্ষেপে গেছে। জ্ঞান হারিয়েছে।

বটে! বটে! জোয়ান তুজন এগিয়ে এসে এবার মাড়োয়ারিটির অশান্ত শরীরটাকে সজোরে সিটের সঙ্গে চেপে ধরল। তবু সে কি

থামতে চায়! পিছনে বসা লাল-শাড়ি মেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। টুকটুকে লাল হয়েছে ওর ফর্সা মুখ—

খ্যাপা মৃগী রোগীর বন্দোবস্ত করে ড্রাইভার সাহেব আবার গাড়ি ছাড়ল।

খেয়ে দেয়ে পাণ্ডুর ফেরী ঘাটে যখন এসে স্টিমারে উঠলাম সূর্য তখন নীল আকাশের পশ্চিমে তাকাচ্ছে। ভিতরে এরি মধ্যে যথা-রীতি জমায়েত হয়েছে শতশত লোক: দীনহীন বেশ; শ্রান্ত, ক্লান্ত, আশা-ভরসাহীন। বাঙালী, অসমিয়া, নেপালী, আর সবচেয়ে বেশি বিহারী। প্রচণ্ড ভিড়ে পা রাখবার ঠাঁই নেই। উপরে এক চক্কর ঘুরে এলাম। ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নভেল পড়ছে সাহেব বিবিরা, ফিটফাট বেয়ারা চায়ের ট্রে হাতে সসম্ভ্রমে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। মন্দ নয় আবহাওয়াটা।

নিচের তলার দম বন্ধ করা ভিড়ে কোন রকমে এক পাশে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার গা ঘেঁষে জলস্রোতের অশ্রান্ত গান, ছল-ছল-ছল-ছলাৎ—

ব্রহ্মপুত্রের চওড়া ঘোলাটে বুকে ঝিকমিক রোদ।

বাঁশী বাজিয়ে স্টিমার ছাড়ল।

মিনিট দশেক পরে আবার সেই বহুবার দেখা দৃশ্য। স্টিমার এসে ভিড়েছে আমিনগাঁওএর ঘাটে। শত শত যাত্রী তাদের ছিন্ন মলিন বোঁচকা আর লাঠি-সোঁটা নিয়ে চাপ বেঁধে দাঁড়িয়েছে গেটের পাশে। কে আগে যাবে। ততক্ষণ ওপারের জোয়ান কুলির পাল স্টিমারের রেলিং টপকে খ্যাপা মৌমাছির মত সবিক্রমে 'আক্রমণ' করেছে যাত্রীদের। মালের জন্যে। টানা টানি, চেঁচামেচি হেঁচড়া হেঁচড়ি, মহা এক কাণ্ড। এরপর গেট খুলতেই মিনিট পাঁচেক ধরে ছেলে বুড়ো মেয়েতে মিলে এমন প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি শুরু হল যা একমাত্র কুম্ভমেলার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

বালির পাড় ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন উপরে এসে দাঁড়ালাম ট্রেন তখন টুইটুম্বুর। মুরগীর খাঁচা। না, তার চেয়েও খারাপ। মানুষে আর রকমারি মালপত্রে সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। কোথাও উঠতে পাইনা। দৌড়াদৌড়ি করে করে গাড়ি ছাড়বার সময় হল। তবে কি আর যেতে পারব না ? হায়—

হঠাৎ দেখি এক কামরার সামনে হুড়োহুড়ি। দৌড়ে গেলাম। ভিতর থেকে দরজা জানলা বন্ধ করে বসে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ খুলতেই এই কাণ্ড। লাফিয়ে উঠে পড়লাম।

গাড়ি ভর্তি সবাই মনিপুরী। এতক্ষণ রিজার্ভ করে রেখেছিল গাড়ি, এবার রেগে অস্থির। কথায় বোঝাতে পারে না, শুধু হাত পা নাড়ে। চুপচাপ জানলার ধারে প্রায় ঝুলে রইলাম। ঘাম ঝরছে।

ছোট্ট গাড়িতে মনিপুরীরা মেয়ে পুরুষে মিলিয়ে প্রায় জন কুড়ি। আর ফর্সা ধব্‌ধবে একটি কচি মেয়ে। গাড়ির গরমে ওর মা জামা খুলে নিয়েছে তার, ট্রাংকের উপর হাত তুলিয়ে নাচ্‌ছে মেয়েটি। মাথায় সোনালী চুল। বড় হলে হয়তো খুবই ভাল নাচবে সে।

—কতদূর যাইবেন !—পাশেই বেঞ্চিতে টান হয়ে যে বসেছিল, সে একটা বিড়ি এগিয়ে ধরে ভাঙা বাংলায় শুধায়।

—দিল্লী।—ফস্ করে বলে বসি।—একটু বসতে দেবেন ?

সে একবার সমর্থনের আশায় অন্যদের মুখে তাকায়। রসকলি আঁকা নাক, মেয়েরা জড়িয়ে কোমরে পরেছে তাঁতের কাপড় এক টুকরা, আর গায়ে জামা। ছেলেদের কারো পরনে ধুতি, মাথায় সাদা পাগড়ী, কারো বা আধুনিক কায়দায় অতি সস্তা রেডিমেড কোট প্যাণ্ট। সবাই নির্বিকার দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকায় একবার। একটু হাসে। অর্থহীন হাসি। তারপর বসবার জন্যে প্রায় ইঞ্চি ছয়েক জায়গা বের হয় রেলের সবুজ বেঞ্চির উপর।

বেশ, বেশ, তাতেই হয়ে যাবে আমার।

ট্রেন ছাড়ল।

আলাপ জমে উঠল।

—আমরা যাব নবদ্বীপ।—এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলতে লাগল সে।—আমাদের গুরু সেখানে। তার পর কালীঘাট, শ্রীক্ষেত্র, মথুরা, আর—বৃন্দাবন!

শুনেই বেঞ্চির প্রান্ত থেকে রোগাটে এক প্রৌঢ়া কণ্ঠে উচ্চারণ করলে—

—মধুর মধুর বংশী বাজে, কই সে বৃন্দাবন!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুশিতে মাথা নাড়লে অর্ধবয়সী লোকটা। যোগীন্দ্র সিং।

বিকেলের নরম গোলাপী আলো ছড়িয়ে পড়েছে ধান কেটে নেওয়া আদিগন্ত মাঠে, নিরালা গাঁয়ে আর কামরূপের ধূসর টিলায়। ট্রেন চলেছে ঝিকিঝিকি। অনেক লোক অতিকষ্টে ভিতরে দাঁড়িয়ে ঢুলছে অবিরাম। মনিপুরীরা অবিশ্রাম বকে চলেছে, প্রাণখোলা খিল খিল হাসিতে নুয়ে নুয়ে পড়ছে সবাই। মণিপুরের অনেক গ্রাম থেকে এসেছে তারা, গোটা ট্রেনে ছড়ানো প্রায় শ'দেড়েক লোক। ঘরের ধান তুলে বেরিয়ে পড়েছে তীর্থ যাত্রায়। নবদ্বীপে।

রাত্রি এল। ওরা সবাই জপের মালার থলিতে হাত ঢুকিয়ে চোখ বুজল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ! দলপতি যোগীন্দ্র সিং বললে,—এইবার আপনি আমার জায়গায় বসুন। আমি উপরে উঠি।—এক লাফে সে বাঙ্কের উপর উঠে গেল।

চমৎকার লোক এই মণিপুরীরা। আমার মণিপুরী বন্ধুর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা সব সুশিক্ষিত, মার্জিত, শহরবাসী। অতি ভদ্র, অমায়িক। কিন্তু এরা এসেছে খাস মণিপুরের গ্রাম থেকে। অনেকে এই প্রথম গ্রাম ছেড়ে বেরোল। চাষী পরিবারের লোক, বর্তমানকালের পরিভাষায় অশিক্ষিত। কিন্তু যে দু-দিন এদের সঙ্গে কাটল শুধু মুগ্ধ চোখে তাদের দেখেছি আর অবাক মেনেছি বারবার।

সবাই হাসিখুশি, একটিবারও কারো মুখে শক্ত কথা শোনা যায়নি। বাইরের লোককে ভয় পায় তারা, তাই সহজে প্রাণের দরজা খুলে উদার আমন্ত্রণ জানায় না। প্রায় সবাই জানে মৃদঙ্গ বাজাতে। গান গাইতে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, আসামের নীল পাহাড়ের সারি ডিঙ্গিয়ে বার্মার সীমান্তে কেমন করে বাংলার সংস্কৃতির ঢেউ গিয়ে পৌঁছুল। মণিপুরের কালচার বাংলা কালচারেরই শাখা ; আর স্বীকার করতে আনন্দ ছাড়া লজ্জার বিষয় নয়, ওদের কালচার কয়েক ক্ষেত্রে বাংলার আলোকে ম্লান করে দিয়েছে। যেমন বৈষ্ণব ধর্মের মূলমন্ত্র প্রেম ভালবাসা অহিংসার প্রচারে ও নৃত্যকলায়। বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও ভব্যতা যদি শিখতে চাও, দেখে এসো মণিপুরীদের। আর সরলতা ? সে তো সব পাহাড়ের লোকদের বুকেই সরলতার মৃৎপ্রদীপ মায়া বুলিয়ে চলেছে। দেখেছি—খাসিয়াদের, মণিপুরীদের, নেপালীদের।

বাংলার পদাবলী কীর্তন রূপ পেয়েছে মণিপুরীদের কণ্ঠে। পারলৌকিক আকর্ষণে কথায় কথায় বাঙালী ছোটে কাশীধামে, আর মণিপুরী আসে বাংলার নবদ্বীপে। সাধ জাগে একবার ইতিহাসের মরচে পড়া পাতা ঘেঁটে সংস্কৃতির এই ভাগীরথী ধারার খোঁজ নিই—

আমার ঠিক মুখোমুখি বসেছে দলের সব চাইতে জোয়ান ছেলেটা। বছর পঁচিশ বয়েস, যেমন উঁচু, তেমনই চওড়া। সস্তা কোট প্যাণ্ট পরনে, খালি পা। মাথায় একটুকরো সাদা কাপড় পাগড়ীর মত জড়ানো। এই প্রথম বোধ হয় বাইরে এল, অবিশ্রান্ত ছটফট করছে ছেলেটি। এই জানলা খুলছে, এই পাখার সুইচ টিপছে। হঠাৎ পাখার সুইচ টিপে দিতেই বন্ বন্ করে ঘুরে উঠল পাখা। হাউ-মাউ করে উঠল শীতার্ত যাত্রীরা। থতমত খেয়ে গেল বেচারা, কেউ কিছু করবার আগেই তিড়িং লাফে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে পাখা থামাতে গেল সে। রক্তারক্তি কাণ্ড। সীমাহীন বিস্ময়ে সে

একবার পাখার দিকে অন্যবার রক্তঝরা হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকাতে থাকে। সবাই যার যার ভাষায় একচোট বকে নেয় তাকে। বেচারীর বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তখনো। সংগে ওষুধ ছিল। বের করে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলাম। কৃতজ্ঞতায় হেসে বাঁ হাতে পকেট থেকে বিড়ি বের করলে সে।

প্রত্যেকের সঙ্গে মস্ত পুঁটলি ভর্তি ঘরের চিঁড়ে ও গুড়। রোগাটে প্রৌঢ়া তাই কাগজে করে খেতে দিলে আমাকে, লজ্জা নম্র ছোট্ট হাসি হাসলে একবার। একটু আপত্তি জানাতেই তার ভাষায় কি বললে, আর মুখ হাত নেড়ে ইঙ্গিতে মা-মাসির মতই ধমক দিয়ে উঠল যেন। আরেক বাঙালী ভদ্রলোক এসে—সামনের বেঞ্চে জায়গা করে নিয়েছিল, সেও খেল।

খেলাম, কিন্তু কি বলবো? ভাষা নেই। তারা মণিপুরী ছাড়া কিছুই জানে না। হাত নেড়ে সাধ্যমত বোঝাতে চেষ্টা করলাম খুব ভাল খেয়েছি। প্রৌঢ়া তৃপ্তির হাসি হাসল মুখ জুড়ে।

রাত হয়েছে বেশ। সবাই ঢুলছে কিন্তু এমনি বসে বসে ঘুম আসে না আমার কখনো। কথা কইবার মানুষ কই? দলপতি যোগীন্দ্র সিং বাংলা বোঝে। কিন্তু সে বাঙ্কে ঘুমিয়ে পড়েছে। অগত্যা ধর মশাইর সঙ্গেই আলাপ জুড়লাম। চিঁড়া চিবুতে চিবুতে কথা বলতে লাগলেন তিনি। আসামে এসেছিলেন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। ম্যাট্রিক পাশ। বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশ। আসাম থেকে সস্তার আধ ঝুড়ি কমলা কিনে চলেছেন, খুলে একটা দিতে চাইলেন আমাকে! বাপরে, এই শীতে!

ধর মশাই গভীর জলের মাছ। শুকনো মুখ, সাপের মত তীব্রদৃষ্টি দুটি চোখ। সাদাসিধে সরল বুদ্ধি এই মণিপুরীদের পাশে বড় বেমানান, বড় বিপজ্জনক বলে মনে হয়! আলাপবিমুখ ধর মশাই দু-একটি কথার জবাব দিয়ে চোখ বুজে মুখ ফিরাল।

ভোর হতেই উত্তরবঙ্গ তার প্রাকৃতিক শোভা চোখের সামনে মেলে ধরল। রেল লাইনের দুধারে শুধু আদিগন্ত চায়ের বাগান। মাঝে মাঝে বালি আর নুড়ি ভর্তি পাহাড়ী নদী, যা বর্ষায় প্রবল প্লাবনে দশ দিক ভাসিয়ে নেয়। আর একটু আলো হতেই উত্তর দিগন্ত জুড়ে দেখা দিল সোনার বরণ হিমালয়। তাই দেখতে গাড়ি জুড়ে হুলুস্থুল। মণিপুরীরা সবাই হাতজোড় করে কপালে ঠেকাল।

—কৈলাস, কৈলাস—সানন্দে বলে উঠল প্রৌঢ়া। আর শিলিগুড়িতে ট্রেন থামতেই ছেলে বুড়ো মেয়ে নেমে দৌড়ল কলতলায়। চটপট্ স্নান সেরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফিরল, সযত্নে নাকে রসকলি আঁকল। এরপর মালা নিয়ে জপ করতে বসল। ঠোঁট নড়তে লাগল অনবরত। গাড়ির অন্যলোকেরা নির্বাক বিস্ময়ে সব লক্ষ্য করে চলেছে ওদের, নতুন ওঠা লোকগুলো সবিস্ময়ে শুধোয়—ওরা কারা মশাই? নেপালী?

হঠাৎ কচি কণ্ঠের কলকাকলিতে পিছন ফিরে তাকালাম। কচি মেয়েটি ঘুম ভেঙে উঠেছে। বছর দুই বয়েস। টক্‌টকে ফর্সা রং। মার হাত থেকে চিঁড়ে কেড়ে নিয়ে খাচ্ছে; আর কি স্বচ্ছ প্রাণখোলা খিলখিল হাসি সেই সঙ্গে। মন জুড়িয়ে গেল এই সোনামাখা ভোর-বেলায়। চটের থলি খুলে বিস্কুট বের করলাম। লজ্জায় মার বুকে মুখ লুকাল সে।

—হ্যাঁ, এই লজ্জা হয়ে গেল! মায়ের পাশে বসা ছোটখাট কালো মণিপুরী অতি পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, আমার প্রসারিত হাত থেকে বিস্কুট তুলে নিয়ে ঝাপটে ধরল কচি মেয়েকে, তার ভাষায় আদর করে লজ্জা ভাঙাতে লাগল।

আশ্চর্য! পিছনের দিকে বসেছে সে। গতকাল দেখতেই পাইনি, উঁচু বেঞ্চির আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। চোখেমুখে তার স্পষ্ট শিক্ষা সংস্কৃতির ছাপ। আর কথা? এমন বিনয়ী লোক জীবনে আর

দেখেছি বলে মনে পড়ে না। নিতাই সিং। ইস্কুলের অদূরেই এক গ্রামে মাস্টারি করে। আই-এ পর্যন্ত পড়েছে। বাংলা সে শুধু জানে তাই নয়, দিব্যি রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী থেকে লাইনের পর লাইন আউড়ে গেল ,— -

—মরণরে, তুঁহু—আওরে আও !

মন ভুলে উঠল। গতরাত কথা বলবার মানুষের অভাবে ছটফট করে কাটিয়েছি, তার পিছনেই পড়ে রয়েছে এমন রত্ন ! হাঁা, বরাবরই দেখে আসছি এমন হয়। কিছুর জন্যে হয়তো তুমি আকাশ পাতাল তোলপাড় করে তুলেছো, শেষ মুহূর্তে তাকে আবিষ্কার করলে দোর গোড়ায়। কিন্তু একে নিয়ে আর পারা গেল না। দিব্যি বুঝে নিয়েছে আমি শিক্ষিত ; কথায় কথায় খালি নমস্কার দিচ্ছে।

—আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু, পেখনু পিয়ামুখ চন্দা— মেয়েটি বড় হলে নাচতে পারবে খুব ভাল ! বললাম, বাপের কোলে মুখ লুকিয়ে চুপি চুপি দুষ্টুমীর হাসি হাস্‌ছে কচি মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে।

নিশ্চয় !—নিতাই সিং বিনয় ভালবাসা ও শ্রদ্ধামিশ্রিত অতি সুন্দর হাসি হাসলেন,—আপনি জানেন না, ওর মা একজন ওস্তাদ নাচিয়ে।

চোখ ফেরালাম। ছিমছাম দোহারা গড়ন। ফর্সা রঙ, ধারালো নাক মুখ। কপালে সুনিপুণ হাতে আঁকা রসকলি, মুখে সস্মিত হাসি। বছর বাইশ বয়েস। কোন ভাবান্তর লক্ষ্য না করে বুঝলাম বাংলা জানে না মেয়েটি।

চা কিনলাম। আবার বের হল চিঁড়ে, গুড়। কথা বলতে বলতে কখন ট্রেন চলতে শুরু করে বিহারে ঢুকে পড়েছে বলতে পারি না। বৈষ্ণব- সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের কোন কিছুই বোধ হয় বাকি রাখেনি সে। আমি পণ্ডিত নই কোন কালে, সশ্রদ্ধ নম্রতায় শুধু তার কথা শুনে যেতে লাগলাম।

সামনের জোয়ান ছেলে, তার পাশের স্নেহময়ী প্রৌঢ়া, বাঙ্কের উপরের আঠারো বছরের সপ্রতিভ কিশোর, দলপতি চালাক চতুর যোগীন্দ্র সিং আর সপরিবার নিতাই সিং সবাই চলেছে নবদ্বীপে। মণিপুরীদের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানে। যাত্রা শেষ হবে বৃন্দাবনে। ওরা ধার ধারে না দুনিয়ার জটিল অর্থনীতির, শোষণ আর আধিপত্যের, হাইড্রোজেন বোমা ও অস্ত্রচুক্তির। তারা জানে শুধু মাঠে মাঠে কাজ, মৃদঙ্গের কোমল মধুর বোল, গান আর নাচ। আর প্রেম। আহা— তাই নিতাই সিং যখন বললে,—আমি দুনিয়ার সব খবর রাখি। আমার বিশ্বাস আমরাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। আমাদের দাবী কম, প্রাণের ঐশ্বর্য অফুরন্ত। আর বাইরের অত্যাচার এখনো আমাদের গিলে ফেলতে পারেনি ভগবানের আশীর্বাদে। তখনি মনে দুর্বার সাধ জাগলো, যাই, দেখে আসি নীল পাহাড়ের ছায়া সুনিবিড় নিভৃত কোলে রাসলীলার আকুল করা নৃত্যশোভা। আর দেখে আসি সেই পবিত্র-ভূমি যেখানে সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন-সাধনা মূর্তি ধারণ করেছিল সার্থক মহিমায়।

জীবনের প্রতি কোন অভিযোগ নেই, নেই কারো প্রতি কোন অভিশাপ। নিতাই সিংএর ক্ষমাসুন্দর চোখে যে দৃষ্টি দেখলাম তা আমাকে ভাবিয়ে তুলল রীতিমত। এই দৃষ্টি আছে বলেই এমন অপরূপ নৃত্যকলার জন্ম দিতে পেরেছে বোধহয় তার জাতির লোক, পেরেছে এমন নম্র মধুর হৃদয় গড়ে তুলতে। নিতাই সিংকে মনে মনে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলাম। আমি নিজেকে চিনি। আমি জানি, আমি তার মত সহজ সুন্দর হতে পারবনা। আমার সমাজের আশেপাশের কেউ হতে পারবেনা।—কোন উপায় নেই!

কথা বলতে বলতে কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। গাড়ি এসে থামল কাটিহার। এবার নামতে হবে। মন দমে গেল। এই দেড়দিনেই যেন গভীর আত্মীয়তার সুত্রে বাঁধা পড়েছি এই সরল সহজ

বুদ্ধি নিরভিমান লোকগুলোর সঙ্গে। জোয়ান ছেলেটা তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত তুলে নমস্কার করল বারবার। সজোরে বুকে টেনে নিতে চাইল আমাকে। প্রৌঢ়ার করুণ চোখ দুটি ম্লান হয়ে উঠল যেন হাচমকা। যোগীন্দ্র সিং হেসে নমস্কার করল। বাচ্চাটার দিকে তাকালাম। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আমার চোখে তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসছে হৃদয় হরণ মেয়ে। আর নিতাই সিং ? জানলার বাইরে সে দুহাত দিয়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরল। একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিয়ে তার সেই অদ্ভুত রমণীয় হাসি হাসল,---যদি কোন দিন মণিপুরে যান, ভুলবেন না আমার কথা!—ভুলবো ? –আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ওর হাতে হাল্কা চাপ দিয়ে বাচ্চাটার দিকে না তাকিয়ে দৌড়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ওভার ব্রীজে উঠলাম।

—মণিপুরে কবে যাব জানি না।

উত্তরবঙ্গ, আসাম ও বিহারের রেল পথের স্নায়ুকেন্দ্র কাটিহার জংশন। জনশ্রুতি বলে যে, আর্যবর্তের আর কোথাও এখানকার মত ভিড় হয় না গাড়িতে। রাত দুপুরে ট্রেনে চড়বো। তাই ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

—আরে, নমস্কার ধর মশাই!—একগাল হাসলাম। রহস্যময় লোকটা বাঁ বগলে বিছানার পুঁটুলী আর ডান হাতে মস্ত কমলার ঝুড়ি নিয়ে চলেছে। বিরক্তি কুঞ্চিত চোখ তুলে সে তাকাল।

আমি শুধাই,—আপনি কলকাতা যাবেন না ? গাড়িটা ছেড়ে দিলেন যে!

—ভাগলপুর ঘুরে যাব। কাজ আছে। জিনিস মাটিতে নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে লোকটা। অসহ্য, বিকর্ষণ জাগানো, শুকনো অতৃপ্ত বাসনা লোকটা। সহসা চমক লাগল। আরে! রাতারাতি এর কমলার ঝুড়ি এতো বড়টি হয়ে গেল কেমন করে! খুঁটিয়ে তাকাতেই বাঁশের ঝুড়ির এককোনে কালিদিয়ে লেখা চোখে পড়ল, বাংলা আখরে, শ্রীযোগীন্দ্র সিং।

সত্রাসে বলে উঠলাম—ও মশাই, আপনার ঝুড়িটা মণিপুরীদের সাথে বদল হয়ে গেল যে ! জলদি নিয়ে চলুন। এখনো হয়ত ওদের ট্রেন ছাড়েনি।

—তাই নাকি !—শ্রান্ত বিরক্ত দৃষ্টিতে সে আমার চোখে তাকাল একবার। তারপর নির্বিকার চিত্তে একটি বিড়ি ধরিয়ে আবার বিছানা বগলদাবা করে ঝুড়িটা টানতে টানতে চলে গেল।

—হতেও পারে। কিন্তু ট্রেনটা এইমাত্র ছাড়ল। খানিক দূর থেকে তার কর্কশ গলার স্বর ভেসে এল। ছিঃ, নিদ্রিত যোগীন্দ্র সিং ঘুম ভেঙে আধ ঝুড়ি কমলা দেখে কি ভাববে ? অনেক কিছু করবার ছিল, কিন্তু নির্বাক দাঁড়িয়ে শুধু ভিড়ের মাঝে অপস্রিয়মান ধর মশাইর ত্রিভঙ্গ মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বিহারের মত গরীব ছন্নছাড়া নাকি ভারতের আর কোন জায়গা নয়। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে শুয়ে আছে অনেক লোক। পথই তাদের বাসা। স্বল্প মলিন বসন, অনাহার-ক্লিষ্ট ভূতুড়ে চেহারা। ওপাশে রেল লাইনের পাশে মাটি থেকে কুকুরের মত উচ্ছিষ্ট তুলে খাচ্ছে—কে ? একটি মানুষ। দুই হাত, দুই পা, সেইসব মানুষের মতই নাক চোখ মুখ। মগজে অনুভূতি আর অন্তরে জ্বালা। কিন্তু নেমে এসেছে পথের নেড়ী কুকুরের সমপর্যায়ে। ভিক্ষুক। এমনি কত দেখেছি বাংলায়, আসামে, বিহারে। জঞ্জালের ভিতর থেকে একটা আলুর টুকরো বেছে নিয়ে ঘিনঘিনে ময়লা আঙুলে সযত্নে মুছে নিয়ে মুখে পুরলে লোকটা। সে থাক। আমি সরে গেলাম। আর কিইবা করতে পারি ? হাঁটতে হাঁটতে কখন এসে দাঁড়িয়েছি রিফ্রেশমেন্ট রুমের সামনা সামনি। কাচের দরজার ওপাশে ছিমছাম বাবুটির ব্যস্ত আনাগোনা। তেমনি দুই হাত দুই পা ওয়ালা মানুষ সযত্নে চিকেনকারির টুকরো মুখে পুরছে। থাক্ তারা। আমি এগোই।

দুই

উপরে ঝকঝকে তারা ভরা আকাশ। প্রকাণ্ড প্ল্যাটফর্ম শেড-এর কঙ্কাল লাগানো হচ্ছে শুধু। হিমে জমে যাচ্ছে শরীর। গাড়ি 'ইন্' করেনি তখনো। শত শত লোক মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ী বেঁধে ট্রেনে উঠবার পায়তাড়া করছে। চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি আর বোঁচকাবুঁচকি। ব্যাপার দেখে ট্রেনে উঠতে পারব বলে ভরসা হল না খুব। সুতরাং রাজনীতি। একটা দলের পাশে বসে পড়লাম।—আঃ, কিধার যায়েগা সাথী?

—এ্যা?—প্রকাণ্ড জোয়ান কুচকুচে কালো লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে। আমার আপাদমস্তকে এক নজর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জানালে, —ছাপরা!

—ওঃ।—এবার দ্বিতীয় অস্ত্র ছাড়লাম। বুদ্ধি করে আগেই আলাপের সূত্র বিড়ি কিনে এনেছি। এগিয়ে দিয়ে বললাম, পিয়ো।— —ব্যাস, কাজ হাসিল। তার নাম বললে,—রাজভুখন। কিচ্ছু ভাবতে হবে না আমাকে। শুধু তার পিছনে পিছনে উঠে পড়া গাড়িতে। বহুৎ আচ্ছা।

এমন সময় বাঁশী বাজিয়ে ট্রেনের প্রবেশ। শত শত মানুষ রুখে দাঁড়ালো বীরবিক্রমে। আর সে কি কোলাহল।

—আরে গঙ্গিয়াকি মায়ি! ইধার!—সে এক কাণ্ড। এরপর চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠবার জন্যে বাছারা এমন হুড়াহুড়ি লাগাল যে আজো এ আমার কাছে এক পরম বিস্ময় কেন দু-দশটি সে রাত্রে ট্রেনের চাকার তলায় কাটা পড়ল না। রাজভুখনকে পরে শুধিয়ে ছিলাম। নির্বিকার সুরে সে বলেছিল: এসব না করেতো উপায় নেই, ভগবান বাঁচানেওয়ালা।

ট্রেন তখনো নড়ছে। রাজভুখন লাফিয়ে একটা কামরার ভিতরে উঠে গেল। তারপর মিনিট দশ ধরে সেই অন্ধকার দরজার সামনে যে ঘটনা ঘটল তার বর্ণনা দেবার ভাষা নেই। শুধু হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে অজস্র কনুই আর গোড়ালির ধাক্কা খেতে খেতে বিস্ফারিত চোখে তাই দেখতে লাগলাম। হায় বাল্মিকী, একেই কি তুমি কিষ্কিন্ধা কাণ্ড বলেছিলে ?

দরজার কাছে একটু ফাঁকা হতেই এগোলাম। ও হরি, পর্বত প্রমাণ মালে আর মানুষে সে এক নারকীয় কাণ্ড। দরজার ভিতরে পা ঠেকানোই অসম্ভব। তবু আশায় বুক বেঁধে এগোই। পিছনে আরো প্রায় জন কুড়ি স্ত্রী পুরুষ। এমন সময় দরজার মুখে আবির্ভাব এক নেপাল নন্দনের। যুবক, ছিমছাম লম্বা গড়ন। উত্তেজনায় মাথার টুপী খুলে নেড়া মাথা বেরিয়ে পড়েছে। কোমরে ভোজালি। বীর-বিক্রমে ডান হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে রক্ত চক্ষু মেলে সে লাফাতে লাগল,—হিয়াসে জায়গা নেহি হ্যায়! নেহি হ্যায়। ভাগ যাও!—শ্রীমানের মারমুখী রুদ্র মূর্তি দেখে ভড়কে তিন পা পিছিয়ে এলাম। নিচের লোকগুলোও দেখি ইতিমধ্যে লাঠি তুলে ধরেছে।

—ই—তুমারা চাচাকা ডিব্বা ? উল্লু—-

প্রায় লাগে আর কি ? এমন সময় হঠাৎ একটা জানলা খুলে বাইরে মাথা বের করল রাজভুখন। হাঁক ছাড়ল,—এ কালা কোট ভেইয়া ! —তিড়িং লাফে ছুটে গেলাম। একমুখ হেসে আমার স-কোট মূর্তি তার প্রকাণ্ড দুই হাতে লুফে নিয়ে চক্ষের পলকে ভিতরে নিয়ে এল, থপ্ করে বসিয়ে দিল এক গাদা ঝুড়ি ট্রাংক বিছানার উপর। মাথা ঠেকল আলোর কাছে, ছাদে। আঃ,—কোথায় শীত। শ্বাস ফেলবার জায়গা নেই। এযে গ্রীষ্মের একশো চার ডিগ্রি দুপুরের গরম। একটানে কোট খুলে ফেলাম। তারপর বিড়ির বাণ্ডিল বের হল: পিয়ো !

রাজভুখন তার প্রকাণ্ড মুখ ভরে হেসে বিড়ি ধরালে। —তুমি কোন কাজের জোয়ান নও। এই দেখো, কত শত লোক গাড়িতে উঠতে পারে নি। কিন্তু ওদের সঙ্গে আওরৎ। আর তুমি ?

চারপাশ তাকিয়ে লজ্জিত হাসি হেসে মাথা নাড়ি। একটু পরেই শ্রান্ত ক্লান্ত নেপালী বীরপুঙ্গব তার সুদীর্ঘ টিকি নেড়া মাথায় ঠিকমত সাজাতে সাজাতে এগিয়ে এসে ধপ্ করে প্রকাণ্ড এক পুঁটুলীর উপর বসে পড়ল। আমার দিকে চোখ পড়তেই তীব্র অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকাল সে রাজভুখনের মুখে। ভাবখানা এই, তুমি থাকতেও এ এলো কোত্থেকে। আবার বিড়ি বের করলাম।—পিয়ো !

মানুষের উপর মানুষ। যে যেমন পেরেছে, বসা, আধবসা, একপায়ে অথবা শূন্যমার্গে আধঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ট্রেন ছাড়তেই খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে হিমেল হাওয়া ছুটে এসে চোখে মুখে সানন্দে চুমু খেতে লাগল। আঃ,—এইবার কেউ কারো শত্রু নয়। এইবার সবাই "সাথী"। এইবার আলাপ জমে উঠবে।

পদ্মলোচন যার নাম, সে সব সময়েই কানাছেলে নয়। নেপালী বীর পুঙ্গবের নাম বীরবাহাদুর উপাধ্যায়। ব্রাহ্মণ। আসামের সুদূর প্রান্ত মার্গেরিটায় অফিস-পিওন। যাকে নিয়ে চলেছে নেপালে। হ্যাঁ, বিয়ে করতেই চলেছে বৈকি ! তার পাশের পুঁটুলীটির দিকে তাকালাম ঃ ছোট্ট জড়োসড়ো বুড়ি, একটা রঙিন বেড-কভার দিয়ে পা মাথা মুড়ি দিয়ে গোল হয়ে পড়ে আছে। কে বলবে জলজ্যান্ত মানুষ। ঠিক ধোপার বোঁচকা। তার অভিমন্যু যে এতক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে এককুড়ি লোকের সংগে গলা ফাটিয়ে লড়াই জিতে এলো, রত্নগর্ভার তাতে না আছে উদ্বেগ, না কৌতুহল। ট্রেনের চলার ছন্দে সে দুলছে, আর মাঝে মাঝে আওয়াজ তুলছে,—গর্‌গর্‌র্‌, গর্‌র্‌র্‌—সুখী বুড়ো বিড়ালটি যেন।

—দাজু না থাকলে ঠিক আরো এককুড়ি লোক উঠত গাড়িতে।—

বোঁচকার চূড়ার উপর থেকে নুয়ে বিড়ি বাড়িয়ে ধরলাম। দাজু হাসলে এতক্ষণে। সহজ দরদী মানুষের প্রাণখোলা স্বচ্ছ হাসি, ঘোর কূটনীতিজ্ঞ সাহেব-সুবোর মাপাজোখা মার্জিত হাসি নয়। লম্বা টিকিটার গিঠ বাঁধতে বাঁধতে বিড়ি নিল সে ঃ আরে সাথী, ভিড়ে টুপীটাই হারিয়ে গেল। আর সহ্য হয়? তিনরাত ধরে চলেছি এমনি ভাবে। আরো পুরা দশ দিন বাদে পৌঁছব বাড়ি। তাও আবার বুড়ী মায়ের সংগে সাতদিন হাঁটতে হবে। হ্যাঁ—

সে তার লড়াইর সমর্থনের আশায় উজ্জ্বল চোখে তাকালে। একটু বিনীত হাসি হাসলে এবার,—আর আমার শক্তির কথা বলছিলে! কথায় বলে, পওরখো হনুমানকো, শক্তি উনেই রামাকো। (পরাক্রমটা হনুমানেরই বটে, তবে আসল শক্তি জোগায় রাম)—

—ঠিক ঠিক, বহুৎদূরের পথ।—রাজভুখন মাথা নাড়ে।—কিন্তু সবাইকে যেতে হবে তো। এতগুলো লোক শীতে ইস্টিশানে পড়ে রইল। এ্যাঁ?

বীর বাহাদুর নিষ্প্রভ চোখে তাকিয়ে বিড়ি টানে, বাঁ হাতে উড়ন্ত টিকিটা সামলাতে থাকে। গল্প শুনেছি, আগে এক জাতীয় কুলীনেরা লড়াই করে বিয়ে করতে যেত। মানে, বর তার বাছা বাছা লাঠিয়াল নিয়ে শোভাযাত্রা করে কনের বাড়ি ঢুকতো। আর অমনি কনের বাড়ির বরকন্দাজরা এগিয়ে এসে রুখতো তাদের ঃ কে যায়রে! দেখি, কতো মুরোদ, আমাদের মেয়ে নিয়ে যাবে! সেই খণ্ড যুদ্ধ অথবা ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ্, যাই বল, কোন পক্ষের কৌলীন্য বেশি তার পরিচয় দিত। এই মুহূর্তে মনে হল সুদূর নেপালের এই মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ তনয়ও যেন তের দিনের পথ লড়াই করতে করতে বিয়ের আসরে চলেছে। বেচারী—

শীতার্ত অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে গভীর রাত্রির প্যাসেঞ্জার ট্রেন। খোলা দরজা দিয়ে হুহু করে ছুটে আসছে হিমশীতল

হাওয়া। এবারে আর সপ্রেম চুমু খাওয়া নয়, গায়ে মাথায় যেন সূঁচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে। আঃ, দরজাটা বন্ধ করে দাওনা কেন? বটে, এমন সাধ্য কার! দরজার কাছে চাপ বাঁধা মানুষ, কত তা বলতে পারিনে। কারো গা চুলকাবার সাধ্য নেই, এমনি জমাট বাঁধা ভিড়। বর্ষায় দেশে বাড়িতে খালে বিলে যেমন খলুই ভর্তি কই মাছের গাদাগাদি, তেমনি নিশ্চুপ নিঃসাড় মানুষগুলো সাদা ঠাণ্ডা কাপড়ে মুখ মাথা মুড়ি দিয়ে খাড়া হয়ে আছে কোনক্রমে, দুলছে ট্রেনের দোলানির সাথে।

কয়েকজন লোক উস্‌খুস্ করছে বাথরুমে যাবে বলে। যেতে হলে মানুষের মাথায় পা দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু ভেবোনা এর চেয়ে ভীতিদায়ক ভিড় জীবনে দেখিনি আর। দেখেছি। উনিশশো পঞ্চাশ সালে। সবেমাত্র আসাম লিংক-এর নতুন লাইন খুলেছে। দুই বাংলায় চলেছে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। কলকাতা থেকে শিলঙ ফিরছি একা। একটা দরজা ভাঙা ডাক গাড়ির ভিতরে প্রায় দু-শো মানুষ। ছেলে বুড়ো মেয়েলোক। সব রিফিউজী, সব। শুধু আমি ছাড়া। সেই গাড়িতে বেঞ্চ নেই একটাও। নেই জানলা। শুধু লম্বা দুটি বাঙ্ক। একটাতে ঘাড়গুঁজে বসেছি আমি পা গুটিয়ে। দুদিনে একফোঁটা জল পড়েনি মুখে। সারা পথে স্টেশনে স্টেশনে মেয়েরা রিফিউজীদের রুটি তরকারি চা খাইয়েছে। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে হাত পেতেছিলাম, চকচকে চোখে চেয়ে কলেজে পড়া মেয়ে ভলান্টিয়ার জবাব দিয়েছে,—আপনি তো রিফিউজী নন্!

তা নই বটে! গঙ্গা পেরিয়ে সেই যে বাঙ্কে উঠেছিলাম আর দুদিন নিচে নামিনি। এপ্রিলের গরমে ফোস্কা পড়েছে মুখে। কাঁসার গালসায় মুখ লাগিয়ে সবাই জল খাচ্ছিল, পাগলের মত সেই জল চেয়ে খেয়েছি। এঁটো জল। আর সরু বাঙ্কে অসহায়ের মত

বসে বসে ত্নদিন দেখেছি—নিচে মুরগীর খাঁচায় কলেরা শুরু হয়েছে। রাস্তায় বিনি পয়সার দান খেয়ে এবার রিফিউজীরা কলেরায় কাৎরাচ্ছে। প্রায় ত্ন-শো লোক। শিয়ালদা থেকে ওদের পাঠাচ্ছে আসাম। দাঙ্গায় সর্বস্ব খুইয়ে মাত্র কদিন আগে এসেছে তারা পাকিস্তান ছেড়ে। আত্নল গায়ে যুবতী মা বাচ্চাকে বুকের ত্নধ খাওয়াচ্ছে। গরমে প্রায় দিগম্বর হয়ে বসে আছে দৃষ্টিহীন বুড়ো। ভেদ বমি শুরু হতেই ভয়ে ঘৃণায় পশু হয়ে গেল সবাই। —ফেলে দাও ওদের নিচে, ফেলে দাও, ওদের নিচে ফেলে দাও, ওদের জন্যে আমরা মরতে পারব না।

ভয়ে কাঁপছিলাম আমি। একটি বছর ত্রিশের মেয়েকে ঠেলে ঠেলে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা। নির্জীব, নির্বান্ধব রিফিউজী মেয়ে, কেঁদে পা জড়িয়ে ধরছিল সবার,—আমায় ফেলে দিও না গো, কেউ নাই আমার। সোয়ামী ছেলেকে সাতদিন আগে মেরেছে ডাকাতরা।—প্রচণ্ড ভেদবমি হচ্ছিল তার। দশ মাইল বেগে নতুন লাইনের ট্রেন চলছিল ঝিকি ঝিকি। বাইরে রাত। মেয়েটা প্রেতিনীর মত ডুকরে কাঁদছে। ফেলা আর হলনা তাকে। আরো তিনজন ভেদবমি শুরু করেছে তৎক্ষণে। তাদের নিজের লোক ছিল সঙ্গে। কি করবো ! হাঁটু গুঁজে বসে কাঁপছি। ত্নদিন হল নিচে নামতে পারিনি। শেষ রাত্রে মারা গেল নিঃসঙ্গ মেয়েটি ! রিফিউজী। তার নাম জানেনা কেউ। সীমাহীন ঘৃণায় ওরা টেনে তার প্রাণহীন দেহটা দরজা গলিয়ে নিচে ফেলে দিল ছায়া-কালো টিলার পাশে, এপ্রিলের তারাভরা আকাশের নিচে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মুখে দারুণ বিপদে মানুষ কেমন করে পশু হয়ে যেতে পারে তাই দেখেছিলাম আমি। শিউরে উঠেছিলাম শুধু। আর কিছু করতে পারিনি। এরপর স্বপ্নে সেই দৃশ্য দেখে কত নিস্তব্ধ রাতত্নপুরে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে গায়ের ঘাম মুছেছি।

একটা অন্ধকার স্টেশনে এসে থামল ট্রেন। প্রকাণ্ড এক বিছানা নিয়ে এক মাড়োয়ারি ছুটে এলো। মুখ ভরতি বসন্তের বীভৎস স্মৃতিচিহ্ন। হাঁ হাঁ করে উঠল দরজার লোকগুলো। জায়গা কোথায়! কিন্তু ট্রেন ছাড়ল তখুনি। ছুঁড়ে ভিতরে ফেললে সে বিছানা, সেটা সোজা দরজার মুখে বসা লোকটার ঘাড়ে পড়ল। তন্দ্রা ভেঙে বুঝি বেচারী ককিয়ে উঠল। দুর্ধর্ষ মাড়োয়ারি লাফিয়ে ফুটবোর্ডে উঠে দাঁড়াল—এ্যাই, অন্দর আনে দেও!

সে এক মহা তর্কের ঝড়। কিন্তু উঠে যখন পড়েছেই লোকটা, তখন বাইরে থাকতে দিওনা তাকে, ঠাণ্ডায় পড়ে যাবে। বেঞ্চিতে বসা পুলিশী চেহারার লম্বা চওড়া লোকটা উঠল। পরনে ধুতি, গায়ে পিতলের বোতাম লাগানো কালো কোট। কদম ছাঁট চুল।—এ্যাই, তুমি উঠে দাঁড়াও না কেন? তা হলেই তো লোকটা ভিতরে আসতে পারে।

—হ্যাঁ, উঠে দাঁড়াও! উঠে দাঁড়াও!—গাড়িময় রব উঠল। নইলে ঠাণ্ডায় মাড়োয়ারিটি ঠিক গাড়ি থেকে নিচে পড়ে যাবে। কিন্তু মাটিতে বসা লোকটি নির্বিকার। বিড়বিড় করে কি বললে সে, ভাল করে মাথা মুড়ি দিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসল।

—আরে, এ ক্যায়সা বাত্। উঠে দাঁড়ায় না কেন ব্যাটা। আলবৎ দাঁড়াতে হবে তাকে।—সবাই হৈ হৈ করে উঠল।—এই উঠে দাঁড়াও।—

ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে হিহি করে শীতে কাঁপছে বসন্তের দাগওয়ালা লোকটা। দয়াভিখারী ভুঁড়িওয়ালা ব্যবসায়ী লোকটা। কালো কোর্তা গায়ে জোয়ানের পুলিশী মেজাজ এতক্ষণে বিগড়াল বুঝি।—তবেরে—সজোরে সে বসা লোকটার ঘাড় চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুলে ধরল। হৈ হৈ করে উঠল সবাই। পরমুহূর্তেই পাথুরে স্তব্ধতা নেমে এল জমজমাট গাড়ির ভিতরে। শুধু ট্রেনের

চাকার বজ্রনির্ঘোষ, আর হিমেল হাওয়ার আনাগোনা। কারো মুখে কথা নেই। শুধু দেখছে, বেদনা বিস্ফারিত চোখে রাত দুপুরে যেন এক দুঃস্বপ্ন দেখছে সবাই। মাথা থেকে কাপড় খসে পড়েছে তার, কালো কুৎসিত মুখটা নুয়ে পড়েছে সীমাহীন বেদনায়, ধিক্কারে। বাঁ-চোখটা নেই, সেখানে গভীর একটা গর্ত, যেন অন্ধকার নরকের গহ্বর। আর কোমরের নিচ থেকে তার পা দুটো দুমড়ানো—শুকনো, নির্জীব, অতিসরু, বীভৎস। জোয়ান লোকটা যেন হঠাৎ পঙ্গু হয়ে গেছে ভূত দেখে। নির্বাক বিস্ময়ে হতভাগাকে গলা ধরে ঝুলিয়ে তার খালি চোখের গর্তটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। ছুটন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে হতভাগা তালে তালে দুলছে। হঠাৎ যেন কালো কোর্তা গায়ে পুলিশী লোকটা সম্বিত ফিরে পেল। তেমনি এক ঝটকায় তাকে ভিতরে কোথায় ছুঁড়ে ফেলে বেঞ্চিতে বসে পড়ল। ফোঁস করে মস্ত এক শ্বাস ফেলে সে বললে—এ কায়সা খাড়া হোনে সক্তা ?—তারপর চোখ বুজে মাথাটা হেলিয়ে দিলে। এইবার দাঁড়াবার জায়গা হয়েছে। মাড়োয়ারিটি নিঃশব্দে ভিতরে এসে দাঁড়াল।

রাজভূখণ বললে সব। ছেলেবেলায় ছেলেগুলোর এমনি চোখ কানা করে হাত পা দুমড়ে ভেঙে দেয়। তারপর হাটে বাজারে এদের দেখিয়ে লোকের দয়া জাগিয়ে পয়সা রোজগার করে। সে বললে,—এই হতভাগা নিশ্চয় কোন দলের খপ্পর থেকে পালিয়ে এসেছে চুপি চুপি।—হবেও বা। বাজারে ইস্টিশানে পথে ঘাটে এমনি কত বিকলাঙ্গ দেখেছি, কত ভয়ংকর-দর্শন ভিক্ষুক, কত বীভৎস মূর্তি। হতভাগার ইতিহাস জানতে দুর্বার সাধ জাগল মনে। কিন্তু নিশ্চিত জানি আমার কোন প্রশ্নের জবাব দেবেনা সে।

সবাই ঢুলছে। দাঁড়ানো, বসা অথবা ঝুলন্ত অবস্থায় সবাই ঢুলছে।

পুলিশী লোকটার নাকের গর্জন ট্রেনের চাকার নির্ঘোষকে ছাপিয়ে উঠেছে। আমার ঘুম নেই। মাঝ রাতে দেখা এক মিনিটের ট্রেজেডি জুড়ে বসেছে আমার সব চিন্তা ভাবনা। অনর্গল বকে চলেছে রাজভুখন। তার জানাশোনা কার ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ছোটবেলায়, বহুকাল পরে এমনি এক পঙ্গু ভিক্ষুকের গায়ে চিহ্ন দেখে তারা চিনতে পারে তাকে। সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলে। এমনি আরো কত কি।

থানা বীহপুর জংশন। বেশকিছু লোক নেমে গেল। উঠল না কেউ। আঃ, এবার একটু ঘাড় ফিরিয়ে আশে পাশে তাকাতে পারব। সুযোগ পেয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল এবার।

মাটিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছে দুটি লোক। কাপড়ের নিচে ওদের শরীর থর থরিয়ে কেঁপে উঠছে। উঃ, কী শীত। ওভারকোটের কলারটা তুলে দিলাম। ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ চোখ তুলে তাকালে রাজভুখন, কম্পমান লোকদুটোর দিকে দেখিয়ে বললে,—দেখেছো?

—হুঁ! শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছে বেচারীরা। কাঁপছে।—শীতে নয়। ম্যালেরিয়া। আসামের জ্বর। বিজ্ঞের মত মাথা দোলায় সে।—শীতের সময় হাজার হাজার লোক বিহার থেকে আসাম ছোটে কাজের খোঁজে। খুব জ্বর হচ্ছে এবার, জ্বর নিয়ে ফিরছে তারা।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে আরেক দৃশ্য। মণিপুরীদের কামরায় দেখেছিলাম আরেকটি লোক। ষাটের উপর বয়েস, হাড় জির জিরে চেহারা। এমনি মাটিতে লুটিয়েছিল রাতভর, বুক পেতে পড়েছিল একটা দুর্গন্ধময় চটের বস্তার উপর। রাতে কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু কেশেছে বুড়ো। দুপুর বেলা খেয়াল হল আমার। অসহনীয় হাঁপানীর টানে প্রায় মূর্ছিত হয়ে গেছে লোকটা, উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়েছে চটের বস্তায়। হাপরের মত শ্বাস টানছে একটানা। কাটিহারে যখন হুড়-মুড়িয়ে সবাই নেমে পড়ছে তখন মাথা তুলে শুধালে বুড়ো,—কোথায় এলাম!

—কোথায় যাবে তুমি ?—নুয়ে শুধাই তাকে।
—উড়িষ্যা। সম্বলপুর।—হাঁপাতে হাঁপাতে বলে সে।—তিন বচ্ছর পর ঘর ফিরছি আসাম থেকে।
—ঠিক আছে। বসে থাকো।—আবার কাশির ধমক আসতেই লুটিয়ে পড়ল সে।—এই ট্রেনই তোমাকে স্টিমার ঘাটে নিয়ে যাবে।—
—বলেছিলাম আমি। আর বিস্মিত আতঙ্কে ভাবছিলাম, নির্বান্ধব একা একা সে, কোনকালে কি তার ব্যাধি জড়োজড়ো শুকনো শরীরটাকে নিয়ে কলকাতা পেরিয়ে সম্বলপুর পৌঁছুতে পারবে ?

জমি নেই, ঘর নেই, শিক্ষা নেই, অর্থ নেই, কারো সহানুভূতি নেই : শুধু আছে মানুষ বলে প্রমাণ করবার মত দুটি হাত দুটি পা আর চোখ মুখ নাক।—হাজারে হাজারে লাখে লাখে এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিহার থেকে আসামে, উড়িষ্যা থেকে বাংলায়, মাদ্রাজ থেকে সিংহলে, দূর দূরান্তের বিপদ সংকুল পাহাড়ে সমুদ্রে নগরে গঞ্জে। শুধু দুমুঠো ভাতের, নয়তো রুটি, নয়তো ছোলার প্রত্যাশায়। এদের বাগে পেয়ে প্রতিনিয়ত ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে শিক্ষিত বাবুর দল বাগানে গঞ্জে কারখানায়, আর রক্তলোভী ব্যবসায়ীর দল হাটে হাটে বন্দরে বন্দরে। অভিযোগ করবার মত মানসিক উন্নত বৃত্তি নেই, নেই অভিসম্পাত করবার মত সাহস। এদেরই সহজাত সরলতার সুযোগ নিয়ে হাটে হাটে জাঁকিয়ে বসেছে অপূর্ব যতো ওষুধের কারবার। বেজায় সস্তা ওষুধ, আরো সস্তা তার নিয়ম কানুন। আলু পটল সের ওজনে বিকোয় এই ধর্মক্ষেত্রে, কিন্তু মানুষের প্রাণের সে মর্যাদাও নেই। মুরগীর খাঁচার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরছে তারা। Home, Sweet home! কেন ? বাড়িতে মরবে বলে।

রাজভুখনও আসছে আসাম থেকে। গৌহাটীতে তার চাল ডালের

দোকান! ফি বছর শীতে বাড়ি যায়। হ্যাঁ, এদের তুলনায় সে সুখী বৈকি। তার ছোট্ট দোকানে নিজ হাতে পাল্লা ধরে সে, বাড়িতে আছে পরিবার। ছেলেকে স্কুলে পড়াচ্ছে সে। তাকে বাবু করবে। হাকিম করবে।

—পড়াশুনা না করলে আজকাল দুনিয়ায় ভাত নেই, বুঝলে?—ঘুম জড়িত হাই তুলে রাজভুখন তার দৃঢ় অভিমত জানায়।
রাত্রিশেষের আমেজে অজান্তে কখন চোখের পাতা ভারি হয়ে এল। ঘুম। ঘুম। এমন বসে বসে এর আগে ঘুমুইনি কখনো। হঠাৎ গোলমালে ঘুম ভাঙল। মজঃফরপুর স্টেশন। চোখ মেলেই দেখি পূর্বদিগন্ত সূর্য-সম্ভাবনায় রক্তিম। বীর বাহাদুর ঘুমুচ্ছে, মাথা বুকের ওপরে ঢলে পড়েছে। সুদীর্ঘ টিকি কচি মেয়ের মত মনের আনন্দে নেড়া মাথার উদার প্রাঙ্গনে খেলে বেড়াচ্ছে।

এবার সবাই চোখ খুলেছে! পুলিশী লোকটা তার প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়ায় গর্বমিশ্রিত স্নেহে মোচড় দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। : খেয়াল হতেই পিছনে তাকাল সে,—আরে, পা ভাঙা বে'র যে পাত্তাই নেই। তাজ্জব।
—অ্যাঁ! সবাই চমকে উঠলাম। শেষ রাত্রির ঘুমন্ত নিঃস্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে কোন ফাঁকে অভিশপ্ত হতভাগ্য পঙ্গু ট্রেন থেকে গড়িয়ে নিচে নেমে চলে গেছে। কোথায়, কেউ জানেনা। জোয়ান লোকটা অকারণ বিজ্ঞের মত গোঁফ দুমড়ে মাথা নাড়তে লাগল শুধু।

ট্রেন ছাড়ল, থামল সোনপুর জংশনে। এক সাধুবাবা উঠলেন। ভস্মমাখা, উপবাস ক্ষীণ তনু, জটাজুটধারী। গাঁজার ধোঁয়ায় রক্তবর্ণ ভাষা ভাষা দুটি চোখ। হাতে কমণ্ডলু, গলায় মস্ত রুদ্রাক্ষের মালা। দেখলেই শ্রদ্ধা হওয়া উচিত। কিন্তু তার পিছনের চেলাটিকে দেখে মুষড়ে পড়লাম। সাক্ষাৎ ফেরারি আসামী। ছোট কদম ছাঁট চুল, দুর্ধর্ষ

জোয়ান, গোঁয়ার গণ্ডমূর্খ চেহারা। গাড়িতে উঠেই হাঁক ডাক গালাগালি শুরু করে দিল। বসলেন গুরু শিষ্য। সাধুবাবা ইঙ্গিতে জানালেন, জল। শিষ্য সবাইকে পা দিয়ে মাড়িয়ে জল আনতে ছুটল। এ আবার কেমন গুণ্ডা—পাবন মহাত্মা। ভাবনা লাগল।

বীরবাহাদুরের মা এতক্ষণে পুঁটুলীত্ব পরিহার করে মাথা খাড়া করে উঠে দাঁড়াল। তারপর সোজা সাধুবাবার পায়ে লম্বা হয়ে পড়ে প্রণাম করল। সাধুবাবা সস্নেহ চোখে তাকিয়ে আশীর্বাদ করলেন। চোখে মুখে নীরব প্রত্যাশার ছাপ ফুটে উঠল যেন। ইতিমধ্যে এক মালসা জল নিয়ে ছুটে এসেছে শিষ্য, এসেই বীর জননীকে এক ধমক,—এ্যাই, হট্ যাও! জেনানা কি কোই কাম নেহি হ্যায় ইধার!—
—সাধুবাবা ব্যথিত দৃষ্টি তুলে তাকালেন। আকারে ইঙ্গিতে চেলাকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন, বোঝা গেল তিনি মৌনী। বীর জননী ততক্ষণে কাপড়ের খুঁট খুলে একটি চকচকে আধুলি বাবাজীর পায়ের কাছে রেখে দিয়েছে। এবার চেলা শান্ত হল, ফিক্ করে হাসবার প্রয়াস পেলে একটু, এরপর আধুলিটি পকেটস্থ করে বেঞ্চির উপর জাঁকিয়ে বসল।—রাম—রাম! আঃ—
সাধুবাবা একটানে মালসার অর্ধেক জল টেনে নিয়ে বাকিটা চেলার দিকে এগিয়ে ধরলেন। চেলা কিছুটা খেয়ে বীর জননীর প্রসারিত হাতে এক আঁজলা প্রসাদী জল ঢেলে দিল। বৃদ্ধা ভক্তিভরে তাই খেলে একটু, আর বাকিটা বলা নেই কওয়া নেই আচমকা তার ছেলের নেড়া মাথার তালুর উপর চাপড়ে দিল। রাগে ফেটে পড়ল বীর বাহাদুর। প্রসাদী জলে তার মাথা মুখ সব ভেসে গেছে শীতের সকাল বেলা। অন্ধ আক্রোশে সে তার মাকে তার মাতৃভাষায় যে প্রচণ্ড গালি দিল তার মানে বুঝলাম না ঠিক, কিন্তু বিষয়বস্তু বুঝতে কষ্ট হয়নি কোন। সাদীর সময় সাধুর আশীর্বাদ খুব ভাল। তার

মার এ যুক্তি বুঝতে পারলাম সবাই। আধা হিন্দী মিশিয়ে বলে সে।

মিটমিট করে চেলা তাকাচ্ছে বীর বাহাদুরের দিকে। ফিরে ফিরে চোখ গিয়ে পড়ছে তার চকচকে খাপ বন্ধ ভোজালীর উপর। ওটা না থাকলে সে গুরুর প্রসাদী জলের অপমানের শাস্তি বুঝিয়ে দিত নেড়াটাকে। এরই মাঝে ট্রেন ছাড়ল।
চেলার ভয়ে অমন ডাকসাইটে সাধুর দিকে এগোতে পারছে না কেউ। সবাই সতৃষ্ণ চোখে বাবাজীর ধ্যান মগ্ন মূর্তির দিকে তাকাচ্ছে বারবার। চেয়ে দেখি বিরাট দেহী রাজভুখন কি এক বিষম তাড়নায় ছটফট করছে। সহসা যেন দুর্বার শক্তিতে সংকোচ কাটিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, সাধুবাবার দিকে পা বাড়াল।
কল্কি সাজতে সাজতে বিরক্ত দৃষ্টিতে চেলা চোখ তুলে তাকালে একবার। এরপর অতি ছোট্ট কিন্তু সহজ বোধ্য ইঙ্গিতে রাজভুখনকে জানালে যে দূর থেকে প্রণাম করে প্রণামীটা যেন তারই হাতে দিয়ে দেয়।

তাই হল।

সেই শুরু হল। সারা গাড়ি জুড়ে হুল্লোড়। প্রণাম আর প্রণামী। চেলা রুটিন মাফিক অতি রুষ্ট মুখে সিকি আধুলিগুলি পকেটস্থ করে বাঁকা চোখে নাস্তিকদের দিকে তাকাতে লাগল বারবার। আমি বিড়ির বাণ্ডিল এগিয়ে দিয়ে বীর বাহাদুরকে বললাম,—পিয়ো!
কলকেয় আগুন ধরিয়ে চেলা সাধুবাবার মুখের সামনে ধরল। লাল চোখ মেলে কলকেটা তুলে নিয়ে টান দিলেন তিনি। এইবার চেলা মুখ খুলল। বেশ বলিয়ে—কইয়ে! কর্কশ কণ্ঠে সে সাধুবাবার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে লাগল। তার শিষ্যরা নাকি লাখপতি। এরোপ্লেনে তাকে এখানে ওখানে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু যৌবনে তিনি গান্ধী মহারাজের শিষ্য ছিলেন কিছু দিন, তখন থেকেই তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি থার্ড ক্লাশ

ছাড়া চড়বেন না। হ্যাঁ, তার পাদোদক খেয়ে কত রোগী ভাল হয়ে গেছে সে খবর কাগজে পর্যন্ত বেরিয়েছিল একবার।

এই বলে মুণ্ডিত মস্তক বীর বাহাদুরের দিকে চেলা তীক্ষ্ম বিদ্রূপ মাখা দৃষ্টি হানল। নেশায় ব্যোম হয়ে বাবাজী কলকেটা চেলার দিকে বাড়িয়ে ধরে চোখ বুজলেন।

চেলা কাল বিলম্ব না করে নিবস্ত কলকেয় প্রাণপণ টান দিল। রাজভূষণ এইবার প্রসাদের প্রত্যাশায় এগোল। ব্যাটা দেখছি ঘুঘু।

ট্রেন ছোট ইস্টিশনে থেমেছে। একটু বাদেই দরজা খুলে হুড়মুড়িয়ে এক প্রকাণ্ড দারোগা সাহেবের আবির্ভাব, পিছনে দুই পুলিশ আর রেলের গার্ড। চেলা লাফিয়ে উঠল। কিন্তু তার আগেই দুই পুলিশ তাকে দুপাশ থেকে জাপটে ধরেছে। কি তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি। কিন্তু এসব ছেলেমি নিষ্প্রয়োজন বুঝে বাবাজী নেশার মৌতাতে চোখ বুজে নির্বিকার বসেই রইলেন। দারোগা এগোল, রুল ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে মুখিয়ে উঠল,—বলি বাবাজী, এবারে মাল কোথায় রেখেছো! এবার যে জাল পেতেছি আর ধরা না দিয়ে পারলে না।

আমাদের বিস্ময় পৈ পায় না। চেলা তখনো লড়াই করছে প্রাণ-পণে। দুটো পুলিশ তাকে সামলাতে পারছে না। অগত্যা জোয়ান পুলিশী লোকটা তার কালো কোর্তা গায়ে তার বিরাট দৈর্ঘ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। জলদমন্দ্রিত স্বরে বলে উঠল,—আরে, দেব নাকি উল্লুটাকে দু-চারটে কিল,—তারপর তার ঘাড়ে একটা মোচড় দিতেই ককিয়ে সে বসে পড়ল।

এবার সাধুজীর পালা। দারোগার কোন কথারই জবাব দিচ্ছে না সে। নেশার আমেজে চোখ ঢুলু ঢুলু। আচমকা তার জটাধরে একটান মারলে গোলগাল দারোগা সাহেব, আর পর মুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠল,—এই যে, জটার ভিতর রেখেছে সব মাল! খালি আফিং!

আফিং! তাই বলো। এতক্ষণে গুণ্ডা পাবন সন্ন্যাসীর রহস্যটা

পরিষ্কার হল। দিব্যি আহ্লাদে আটখানা হয়ে দারোগা সাহেব গুরু প্রভুকে টানতে টানতে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। গার্ড বাঁশী বাজিয়ে দিলে। চলন্ত গাড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে আমরা দেখলাম নেশায় টলতে টলতে মাথা নুইয়ে বিগত জটা সাধুজী স্টেশন ঘরের দিকে চলেছে, পিছনে উদ্ধত শির বীভৎস দর্শন শিষ্য।

ট্রেন বাঁক ঘুরতেই রাজভুখন ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে হাউমাউ করে উঠল,—লেকিন হামারা পয়সা? উঃ, শালা বেতমিজ!—আরে অভি সাপ নিকল গয়া, লকড়ি পীটনেসে ক্যা,—পুলিশী লোকটার মুখে এই প্রথম মৃদুমন্দ হাসি ফুটল, কদম ছাঁট চুলে হাত ঘষে গোঁফে চাড়া লাগাল সে।

বাকি সবাইর এতক্ষণে তাদের প্রণামীর কথা মনে পড়েছে। তুমুল শোকোচ্ছ্বাস। সীমাহীন তৃপ্তির ও জয়োল্লাসের আলো খেলে বেড়াচ্ছে বীর বাহাদুরের চোখে মুখে। চারপাশের ভক্তিপ্রাণ শোক-সন্তপ্ত মুখগুলোর দিকে একঝলক খুশির দৃষ্টি বুলিয়ে সে আমার দিকে হাত বাড়ালে,—বাজে! এওড়া বিড়ি দিনুস্!—তারপর গান ধরল,—ফুলোখরানি লে লেও দাই, টুপি ধোই দিম্‌লা, টুপি ধোই দিম্‌লা—

সেই যে মুখ বন্ধ করল রাজভুখন, সারা পথ আর একটি কথাও বলেনি। স্টেশনে গাড়ি ঢুকতেই নড়েচড়ে উঠল এবার। থমথমে গলায় বললে,—পরের ইস্টিশান ছাপরা। গাড়ি খালি হয়ে যাবে একেবারে। আর ট্রেন ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল টি. টি. ই। গোটা গাড়ির ভিতরে যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল মুহূর্তে। ভাবছিলাম। স্নান করিনি তিনদিন। ঘুমুইনি। একবার যাত্রা ভঙ্গ করলে কেমন হয়? মনস্থির করে ফেললাম। টিকিট পরীক্ষক টিকিট-ছাড়া দুজনকে পাকড়াও করেছে ও পাশে। কথা কাটাকাটি চলছে পুরো মাত্রায়। ব্যাপার বুঝে জ্বররোগী দুজন এবার কষ্টে সৃষ্টে ভূমি

শয্যা ছেড়ে উঠে বসল। তাকাল চার পাশে। টকটকে লাল দুই চোখ, ফোলামুখ। রাজভুখন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে।

—কিরে, তোরা দুভাই নাকি ?

—হ্যাঁ !—তারা একসাথে মাথা নাড়ে।

—কেন গিয়েছিলি আসাম ?

—চা বাগানে কাজ করতে,—চিঁহি স্বরে কোন রকমে বলে একজন। গলা দিয়ে শব্দ বেরোয়না।

এমন সময় ওদিককার দুই বিনাটিকিটের যাত্রীকে বন্দী করে এগিয়ে এল রেলের লোক। দুই ভাইকে পাকড়াও করলে। টিকিট তো দূরের কথা এক কপর্দকও নেই কারো সঙ্গে। সম্পত্তির মাঝে পৈত্রিক প্রাণ, লোটা আর লাঠি। কিন্তু কর্মচারিটি নাছোড় বান্দা। এসব থিয়েটারি ঢং দেখে দেখে তার চুল পাকল। তাদের দুজনকে ছাপরায় পুলিশের কাছে দিয়ে দেবে সে।

রাজভুখন ওকালতি শুরু করলে এবার।—গরীব বেচারাদের অবস্থা-টাতো বুঝে দেখা দরকার সাহেব !

নওজোয়ান কর্মচারী আধবুড়ো রাজভুখনের দিকে খেঁকশিয়ালের মত মুখিয়ে উঠলো,—আহা মরি ! এদিকে আমার চাকরিটা যাক আর কি ! দয়া দেখানেওয়ালা ! দিয়ে দাওনা ওদের ভাড়া তবে বুঝি।

—বটে !—এতক্ষণে পুরুষত্ব জেগে উঠেছে তার। রাগে কাঁপতে কাঁপতে কাপড়ের খুঁট খুলতে লাগল সে। ভগবানের আশীর্বাদে দুপয়সা কামায় বইকি এই বান্দা। গরীব দুঃখীকে যে দয়া করতে জানেনা সে আবার মানুষ ? হুঁ, অমন বহু "টিট্টি" বাবু দেখেছে সে তার জিন্দেগীতে। হ্যাঁ, এই নাও দুজনের টিকিট, সোনপুর জংশন থেকে ছাপরা। এবার ওদের জেলে নিয়ে যাও, দেখি মুরোদ কত। হ্যাঁ, হমতুম রাজী তো ক্যা করেগা কাজী—

দুই ভাই জ্বরতপ্ত মাথা তুলে লাল চোখে একবার তাদের মুক্তি

দাতার দিকে তাকিয়ে আবার বুকে মাথা গুঁজল। খাওয়া নেই, ওষুধ নেই কদিন ধরে। এবার বার মাইল হেঁটে তবে বাড়ি পৌঁছুতে হবে। সীতারাম! সীতারাম!

এবার আমার পালা। এ পকেট ও পকেট সব জায়গা হাতড়েও কোথাও টিকিটের পাত্তা নেই। মিনিট পাঁচ ধরে গরু খোঁজাই সার হল। অসহায় ভাবে "টিটি" বাবুর মুখের সামনে হাতটা ঘুরিয়ে বিচিত্র মুখভঙ্গী করলাম।—খুঁজে পাচ্ছি না।

—ও অনেকেই খুঁজে পায়না,—তার গলায় ভাবলেশহীন অর্থপূর্ণ সুর।—দিন টাকা ফেলে দিন।

—বারে, টাকা দেব কিসের! আমি প্রতিবাদে ঝলসে উঠি।—

—খেলা নাকি। টিকিট করেছি বলছি, আবার টিকিটের টাকা দেব?

—তা আমি কি করতে পারি?—সে তার কাগজ পেনসিল ঠিক করে নেয়।

—কি করতে পারেন! কেন, আমাকে বিশ্বেস করতে পারেন!—

তাহলে টিকিটের টাকা আর ফাইন দেবেন না?—আমার যুক্তির ধার না মাড়িয়ে সে সোজাসুজি প্রশ্ন করলে।

—না। কেন তুবার টিকিট করবো!—আমি ঘাড় শক্ত করে বলি।

বহুৎ আচ্ছা।—খাতা পেনসিল পকেটে পুরে সে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকায়। দুধারে ছুটে চলেছে অবারিত প্রান্তর। মাঝে মাঝে সর্ষে ক্ষেতের সবুজ হলুদের সমারোহ, আর নিঃসঙ্গ দুটি একটি গাছ। রাজভুখন গলা খাঁকারি দিলে, আমার কাঁধে তার মস্ত ভারি হাতটা রাখলে,—ঘাবড়াও মৎ ভাই, আমি টাকাটা দিচ্ছি।

—পাগল! তোমার পয়সার কি দাম নেই? দেখিনা, ওরা কি করতে পারে!—এবার আমি স্বরূপে আবির্ভূত হই।—আমিও কলেজে পড়েছি, আমিও চাকরি করেছি! টুপীটা খুলে নিয়ে চুল ঠিক করলাম।

—তাই নাকি বাবু!—অবাক চোখে সে আমার আপাদমস্তক দেখে। এতক্ষণে সে জেনেছে আমিও একজন বাবু. হুজুর! আর কোন কথা বলে না সে। কেউনা। বাইরে ছুটন্ত মাঠের দিকে তাকাই আমি। অতি দীন হীন, মাটির উপর কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট কুৎসিত কুঁড়ে ঘরগুলোর দিকে তাকাই। ওগুলোতে কারা থাকে? ওই যে দুই ভাই জ্বর নিয়ে ফিরে এসেছে আসাম থেকে, তারা। গাড়ি ভর্তি লোকগুলোর তীব্র কৌতূহলী দৃষ্টির তীব্র খোঁচা অনুভব করছি প্রতিমুহূর্তে। কিন্তু অনভ্যস্ত নই আমি। ছোটবেলায় অভিনয়ের সময় মঞ্চে দাঁড়াবার সুযোগ হয়েছিল তো ৬ একবার!

দাঁড়িয়ে দুলতে লাগলাম। টিট্টি বাবুও আমার পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে। নির্বিকার, কর্তব্য কঠোর। গাড়ি এসে দাঁড়াল ছাপরা। সব আগে "টিট্টি" বাবু আমাকে ও আরো দুইজন বিনা টিকিট যাত্রীকে নিয়ে নামল গাড়ি থেকে। উদ্বিগ্ন স্নেহকরুণ চোখে তাকাল রাজভুখন, প্রকাণ্ড দুই হাতের থাবা জোড় করে নমস্কার জানাল এবার। বীর বাহাদুর আরো দূরে যাবে, বিনীত হাস্যে সে মাথা নোয়াল,—নমস্কার হুজুর!

পিওন চৌকিদারের বিস্তর সেলাম নমস্কার পেয়েছি জীবনে, আর আশা নেই। আর ওরা আমায় সাথী বলে ডাকবে না, বিড়ি চেয়ে হাত বাড়াবেনা। এবার নিশ্চয় জেনেছে আমি বাবু,—হুজুর!

—চলুন।—টিট্টি বাবু তাড়া দিল। আমরা এগোই।

তিন

জায়গা হিসেবে লক্ আপ চমৎকার। তিনদিক বন্ধ, আর সামনের সমস্তটি জুড়ে মোটা লোহার শিকএর বেড়া, তারি মাঝখানে লোহার দরজা। যে কেউ এসে তোমায় দেখতে পাবে, আর তুমি যে-কোন লোককে। এ যেন বিয়ের আগে ছাঁদনাতলায় বরের ক্ষণিকের অবস্থান। বিনা টিকিটের উদ্ধত যাত্রী আমরা তিনজন, তাছাড়া দুজন গাঁট-কাটা, আর একজন রেল-গুদামের মাল নিয়ে পালাচ্ছিল সে। যথারীতি বিড়ি বের করলাম,—পিয়ো।—তারা খুশিতে দন্ত বিকশিত করলে।

অদূরে মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিল ঘিরে ওরা বসেছে। সামনে ফাইল, রেজিস্টার আর মেমোর ছড়াছড়ি। ওরা হাসছে, কাগজপত্র টানাটানি করছে, কিন্তু আমাদের বিচারের ব্যবস্থা করছে না কিছুই। বর কি দিনভর ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়েই থাকবে? একশো পাউণ্ড ওজনের শরীর নিয়ে বামুন ঠাকুর অনেক কিছুই সইতে পারেন। কিন্তু ক্ষুধা? মাথা বোঁ করে ঘুরে উঠল। গতকালও ভাত খাইনি। হয়েছে, সখ মিটে গেছে লক্ আপের। সাথীদেরও আর সহ্য হচ্ছে না, বিশেষ করে ঘিনঘিনে দুই গাঁটকাটাকে। তাড়াতাড়ি কোট খুলে ফেলে পকেটের নিচে হাতড়াতে লাগলাম। এই যে পাওয়া গেছে! পকেটের ভিতরের ছেঁদা দিয়ে গলিয়ে কোথায় নেমে এসেছে টিকিটটা! তাইতো রাজভুখন এতো হাতড়েও খুঁজে পায়নি। চোরটাকে কোটের একপ্রান্ত ধরতে বলে টিপে টিপে টিকিটটাকে এগিয়ে দিতে থাকি কাপড়ের তলায়। প্রায় দশমিনিটের কসরতের পর সেটি আমার হাতে উঠে এল।

—এই যে পাওয়া গেছে টিকিট ! এই যে,—লোহার শিকের ভিতর দিয়ে হারানো মাণিক এগিয়ে ধরে প্রচণ্ড হাঁক দিলাম। খিদের চোটে চুরাশী লক্ষ ব্রহ্ম লাফালাফি করছে বলে বর্ণনা শুনেছিলাম একবার এক রসিক বন্ধুর মুখে। আজ তার মাহাত্ম্য অনুভব করছি। হাঁক ডাকে কাজ ছেড়ে ছুটে এলো ওরা। সব বুঝেও কি ছাড়তে চায় ? বরাসনে না বসে ছাঁদনাতলা থেকেই বর ফিবে যাবে এ কোন দেশী কথা ! শেষ পর্যন্ত শিক্ষিতের আসরের অমোঘ অস্ত্র জ্বালাময়ী এক ইংরেজী বক্তৃতা ঝাড়লাম। ফল হল ! প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ছাড়া পেলাম।

তাহলে খুলে বলি। বহুদিন আগে এক বন্দীশালার গল্প লিখেছিলাম। উৎরোয়নি মোটেই। কিন্তু গল্পটাকে ভাল করে লিখবার জন্যে রোখ চেপে গেল। কিন্তু একটাও জেলখানা দেখবার সুযোগ পেলাম না আজো। দ্বিপ্রহরে "টিট্টি"বাবুর বিনা টিকিটের যাত্রীদের প্রতি জেলখানার ভয় দেখানোতে মাথায় শয়তানি বুদ্ধি জাগল। ওভার কোটের পকেট ছেঁদা করে অন্তরতম প্রদেশে কারেন্সী নোট ঢুকিয়ে রেখেছি যাত্রার শুরুতেই। মরুভূমির উটের জলের সঞ্চয়ের মত। সেই পথে নিমেষে টিকিটখানা চালান করে দিয়েছিলাম। ঈপ্সিত ফল পেয়েছি নিশ্চয়ই, আরো পেতাম। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষুরে দণ্ডবৎ। ছাঁদনাতলায় দিনভর উপোস করে বসে থাকতে হলে আর বরাসনে বসতে হতো না আমাকে।

আর রেলের সংস্পর্শে নয়। দৌড়ে পথে নামলাম। ঝকঝকে সুনীল আকাশ, মিষ্টিরোদ। কিন্তু আশে পাশে নোংরা শ্রীহীন পরিবেশ। রিক্ত হতাশা মাখা, ক্ষুধা ভয়ংকর। ভাত পাই কোথায় ! ভাত ! দুদিন ধরে খাইনি আমি। একটু একটু বুঝতে পারি পঞ্চাশ সালে বাংলায় যে লক্ষ লক্ষ বাঙালী না খেয়ে মরল সে কি নারকীয় যন্ত্রণা। আচ্ছা, আমিও কি কোনদিন না খেয়ে শীতের ধান গাছের মত

শুকিয়ে মরব ? না, না,—মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ভাতের সন্ধানে ছুটি আমি।

সামনেই একটি লোক পেলাম। লম্বা দোহারা গড়ন, গায়ে হাফসার্ট, হাঁটুর উপর ধুতি। খালি পা ধূলিধূসরিত। অপরিচিত মূর্তি দেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল সে। তাকেই শুধাই,—ভাত পাওয়া যাবে এখানে ?

আমার হিন্দী শুনে বোধহয় চমক লাগে তার। চোখে কৌতূহল আরো নিবিড় হয়ে ঘনায়। মাথা নুইয়ে প্রায় কানে কানে সে শুধায়,

—আপ বাঙালী ?

আমি মাথা নাড়ি।

—আমিও।—এতক্ষণে হেসে ওঠে সে।—আসুন, ভাত পাবেন। সে পা বাড়ায়। আমিও এগোই। গ্রামের দিকে। রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামে সে। নামুক। যেখানে খুশি নিয়ে চলুক আর কথা বলবার শক্তি নেই আমার। চলার আনন্দে খাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, এখন পা শক্তিহীনতায় ভেঙে পড়ছে। শক্ত মাটির উপর থপ্ থপ্ করে চলতে লাগলাম আমি। লোকটা বারবার আমার আগে চলতে চলতে থেমে পড়ে আমার অপেক্ষা করছে। কত সময় পরে জানিনা সে একটা গ্রামের ভিতর ঢুকে থমকে দাঁড়াল। মাথা ঝিমঝিম করছে আমার, কোমর থেকে পা দুটো যেন ব্যথায় ছিঁড়ে যাবে। ওভার কোটটা মনে হচ্ছে বিরাট ওজনের লোহার বেড়ির মত গায়ে জড়িয়ে আছে। —কোথায় হোটেল ?—মিনমিনে গলায় শুধাই আমি। লোকটা হাসে। ওর দন্তপাটি দেখে পিত্ত জ্বলে যায়। ডাকাত নাকি ? বোবা রাগে নিজের কপালে ঘুঁসি মারতে সাধ যায়। কেন মূর্খের মত এতক্ষণ মাঠ ভেঙে একটা অজানা চাষীর পিছু পিছু শুধু বাংলা কথা শুনে চলে এলাম ?

—কোথায় নিয়ে এসেছো ! মতলব কি তোমার, শুনি ? আমি যে মারা যাচ্ছি,—আপ্রাণ চেষ্টায় আমি সোজা হয়ে দাঁড়াই।

—এইতো এসে পড়েছি।—দন্তপাটি বিকশিত করে সে ছায়া ঘেরা উঠানে ঢুকে পড়ে।—আসুন।

হোক ডাকাত, বদমাস, চোর—আর ভাববার ফুরসৎ নেই। আমি ওর পিছনে এগোই,—কই, ভাত দাও শীগগির। ভাত!

সামনেই অনুচ্চ দাওয়ার উপর তিনখানা খড়-ছাওয়া মাটির ঘর। সব ঝাপসা ঠেকছে আমার চোখে। মনে হচ্ছে যেন তপ্ত কড়াইএর উপর দাঁড়িয়ে আছি। প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক একটি যুগ। হঠাৎ লোকটা ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, হাতে একটি কলাই করা থালা ভর্তি সাদা সাদা ভাতের দানা। আঃ, কি সুন্দর! এতো সুন্দর বুঝি কোন মানুষের মুখও নয়, শরতের ঝরা শিউলীর রাশও নয়। বসন্তের গ্রাম পীচের ডালে ডালে সাদা ফুলের স্তবকও নয়। একলাফে দাওয়ায় উঠে প্রায় কেড়ে নিয়ে দাঁড়িয়েই গিলতে লাগলাম। মোটা দলামাখা ভাত, একটু শুকনো ডাল; তার পাশে খানিকটা শাক কি ডাঁটা। হোক। এ দামী হোটেলের বিরিয়ানিকেও হার মানায়।

পাঁচ মিনিটেই যজ্ঞ শেষ। ওঁ শান্তি!

ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে জল নিয়ে এলো সে। এতক্ষণে হাত ধোয়ার কথা খেয়াল হল।

হ্যাঁ, এবার সবাই আসুক এগিয়ে। এবার আমি সবাইকে ভাল বাসতে পারি। প্রেমঘন সহানুভূতিতে বুকে টেনে নিতে পারি। দাওয়ায় বিছানো মাদুরের উপর ধুপ করে বসে পড়লাম, তাকালাম চার পাশে। গাঢ় কৌতুহলী চোখে দরজার পাশ থেকে তুটি কচি মুখ উঁকি দিচ্ছে। আমার চোখ পড়তেই পলকে মিলিয়ে গেল। আহা, কত দীর্ঘ সময় একটি কচি ঢলঢলে সরলতা মাখা মুখ দেখিনি আমি। নিতাই সিং-এর সোনালী চুল মেয়ের মুখ আর তুষ্টুমীর ছায়া ভরা চোখ মনে পড়তেই বুক মোচড় দিয়ে উঠল। লোকটা পান নিয়ে বেরিয়ে এল

আবার। দাঁত বের করে হাসল। এবার আর পিত্ত জ্বলে গেল না রাগে।

—কই, হোটেলে নিয়ে আসনিতো!—হাসলাম আমিও,—ডাকো, ওদের ডাকো!

—আপনিও তো ভয় পেলেন না, দিব্যি চলে এলেন। যদি চোর ডাকাত হতাম!—লোকটা কেবলি হাসে।

কিন্তু ওযে বাংলা কথা বললে! বাংলায় আহ্বান জানালে আমায়,—আসুন!

জাননা তো তোমরা, বিদেশে বাংলা কথা কি যাদুর কাজ করে—

সেই একই বাংলা কথার টান, সে অজানা ভাত সন্ধানী পথিককে নিজের কুঁড়ে ঘরে তুলে এনেছে, আর আমিও অপরিচিত দেশে অজ্ঞাতকুলশীলের পিছু পিছু এতদূরে চলে এলাম—

—আ মরি এই বাংলা ভাষা!

—বাকুঁড়ায় গেছেন কখনো? আমার বাড়ি ছিল সেখানে?—ভাত খেয়ে হুঁকোয় টান দিয়ে নীলমণি রায় শুরু করলে। পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বয়েস। দীর্ঘমাথা, শক্তচোয়াল, শিরাজাগা শক্ত সমর্থ একজোড়া হাত। খাঁটি চাষীর হাত দুখানা। কিন্তু না, তার বাবা ছিলেন বাসনপত্রের ব্যবসায়ী। নেশা ছিল যাত্রাগান, কবিগান। এক কবিগানের আসরে মারামারি লেগে তিনি মারা গেলেন তার জ্ঞাতি শত্রুর ষড়যন্ত্রে। সেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বহুদিন ধরেই নীলমণির বাবার ব্যবসা মাটি করবার ফিকিরে ছিল। মিথ্যা মামলায় হেরে এবার গুপ্ত ঘাতক দিয়ে তার জীবন নাশ করল। সর্বস্ব পণ করে জ্ঞাতি শত্রুর বিরুদ্ধে মামলা চালাল নীলমণি! মামলা টিকলনা শেষ পর্যন্ত। নীলমণি সর্বসান্ত হল। শত্রুর কারসাজিতে ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হল। এরপর স্বল্প পুঁজি নিয়ে জ্ঞাতিশত্রুর সংস্পর্শ বাঁচিয়ে

বহুদূরে এসে ঘর বেঁধেছে আপন মানুষদের নিয়ে। বৌ, এক বিধবা বোন। ছেলেমেয়ে দুটির জন্ম এখানে আসার পর—

বারান্দার এককোণে দুটি পাখীর খাঁচা। একটিতে দুটি বড় টিয়ে; অন্যটিতে তিনটি বাচ্চা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কি চকচকে পালিশ মখমলের মত ডানা। হাত বুলিয়ে দিতে সাধ যায়। খাঁচায় আঙুল দিতেই হাঁ হাঁ করে উঠল নীলমণি,—সাবধান, কামড়ে দেবে কিন্তু।

বাচ্চাদের মন পেতে সময় লাগল। বড়টি ছেলে, নাম শিবু। ছোটটি মেয়ে,—কমলা। মহা মুস্কিলে পড়লাম। বাংলা প্রায় বলতেই পারেনা তারা। আর গেঁয়ো বিহারীতে যা বলে তা বোঝা দুঃসাধ্য। তবু প্রথম পরিচয়ের সংকোচ ভাঙাতেই বাঁধ ভাঙা জলের মত অনর্গল দুটিতে বকে যেতে লাগল। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত আমি নিয়ম মাফিক শুধু এপাশ ওপাশ মাথা নাড়তে লাগলাম।

নীলমণির বিধবা বোন বেরিয়ে এসে প্রায় প্রণাম করে ফেলেন আর কি! লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।—করেন কি, করেন কি!—ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে এমন বিপদে পড়ব ভাবিনি তো! দৌড়ে প্রাণ বাঁচালাম। ব্যথিত চোখ তুলে তাকালেন চল্লিশোত্তর মেয়েটি।

—আমার দেশের ব্রাহ্মণের পদধূলি পড়েনি এ বাড়িতে কোনদিন!—তার গলা রীতিমত ভারি শোনাল।

এদের কিছু বোঝাতে যাওয়া ঝকমারি। এই মা মাসি দিদিদের। দেশের মানুষ পেয়ে দিদির মুখ খুলল। একটানা বিগত দিনের সুখ দুঃখের কথা বলে যেতে লাগলেন তিনি। সেই একঘেয়ে মেয়েলী গল্প: জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, দেশ-বাড়ি, মামলা-মোকদ্দমা। এসব ক্ষেত্রে আমি খুব ধৈর্যশীল শ্রোতা। নিঝুম বসে সব শুনে গেলাম। খুশি মনে উঠে গেলেন তিনি। কিন্তু নীলমণির বৌর ছায়াটি দেখতে পেলাম না।

আকাশ জুড়ে নিবিড় শান্তির বিকেলী ছায়া নেমে এল।

উদাস মেঠো সুর বাতাস জুড়ে—সূর্যাস্তের এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় চিরকাল আমি সময়গুণি। বাচ্চা দুটির হাত ধরে ছুটে মাঠে দাঁড়ালাম এসে। দুর দিগন্তে সূর্যাস্তের বর্ণাঢ্য রঙ্গোৎসব। প্রথমে লাল, তারপর গোলাপি আভায় ছেয়ে গেল আকাশ বাতাস, গাছ পালা, মাঠ প্রান্তর। অস্তরাগের সুর ঝিমিয়ে এল ক্রমশ। শীতের রাত কুয়াশা আর হিমের পাত্র কালো ওড়নায় ঢেকে আকাশে পা রাখল। সন্ধ্যাতারার চোখে চোখ রেখে বললাম: আছো কেমন! যতদূর যাই তাকে সবখানে সবসময় একই ভাবে দেখি, আমার ভিতরের প্রাণের মত সেও চিরসঙ্গী আমার। সাথী।

বাচ্চা দুটির কথাই ভাবছিলাম। কপালগুণে পাশ দিয়েই কমলা লেবুর ঝুড়ি নিয়ে বাজারে চলেছিল একটি লোক। তারা কোঁচড় ভর্তি কমলা নিয়ে খুশির হাসি হেসে আমার আগে আগে বাড়িরপথে দৌড়াল।

কাজ থেকে বাজার করে নিয়ে রাতে ফিরেছে নীলমণি। মাছ, দুধ, বাঁধা কপি। অতিথি সৎকার নিঃসন্দেহে। দরিদ্রের সংসারে কি অধিকার আছে আমার এই ব্যয় বাহুল্যের কারণ ঘটবার। মনটা দমে গেল। কিন্তু যুক্তি খুঁজে পেলাম। মন্দ কি, আমাকে উপলক্ষ্য করে অন্তত বাচ্চা দুটি একটু ভালমন্দ খাবে একবেলা। তাই কি কম!

তিন হাত ঘোমটা টেনে নীলমণির বৌ ভাত দিল আমাদের। দিদি বসেছেন চিরকালের বাঙালী ঘরের মেয়ের মত পাখা হাতে নিয়ে।—এটা খাও, ওটা খাও।

—দুপুরে কি খাওয়াই খেলেন।—নীলমণি আফশোষে তালু দিয়ে শব্দ বের করল।

—জীবনে অমন তৃপ্তিতে খাইনি।—আমি বলি, জানতো, ক্ষুধাই সবচেয়ে সেরা ব্যঞ্জন।

নীলমণি তাড়াতাড়ি শুতে পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে। পথশ্রান্ত আমি। দক্ষিণ প্রান্তের গোটা একখানা ঘর পেয়েছি আমি। পশ্চিম দেয়ালটা প্রায় ভেঙে পড়েছে, বাঁশ আর মাটি ঝরে পড়েছে আলাদা হয়ে। একটা গরু মোষের ধাক্কাও সইবেনা ঘরগুলি। ভাঙা চাল দিয়ে শুক্লা তিথির ক্ষীণ চাঁদ চোখে পড়ে পশ্চিম দিগন্তে। বিছানা নেই, বিচালী পেতে দিয়েছে ঘরময়। খুব ওম হবে নিশ্চয়।

চারিধার নিঝুম। শুধু ঝিঁঝিঁর আর্তনাদ, শেয়ালের কলরব। বিচালীর গাদায় লুটিয়ে পড়তেই মনে হল যেন ঘুমের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঘুম। ঘুম। ঘুম। নিমেষে চেতনা হারালাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানিনা। মিষ্টি ছন্দোবদ্ধ সুরঝংকারে ঘুম ভাঙল। ভাঙা দেওয়াল দিয়ে হিমেল বাতাস ধেয়ে আসছে। শুক্লা চাঁদ ডুব দিয়েছে নিরিবিলি দিগন্তে, নিঃসাড়ে। কিসে ঘুম ভাঙল তবে? উত্তর প্রান্তের ঘরে সুর করে পড়ছে নীলমণি ঃ পদ্মপুরাণ নিশ্চয়। সুস্পষ্ট সুললিত উচ্চারণ, যেন ঘুম পাড়ানি গান—

—মনসার আজ্ঞা পেয়ে দেবতা পবন।
মহাবেগে ধাইলেক করিয়া গর্জ্জন ॥
ক্রমে ক্রমে কালীদহে তরঙ্গ বাড়িল।
এক এক করি ডিঙ্গা ডুবিতে লাগিল ॥—

তার দিদির কাছে শুনেছি দিনে কেমন প্রচণ্ড খাটতে হয় তাকে। জমিদারের ভাগচাষী, এর উপর ছুতরের কাজ করে। আরো অনেক রকম পরিশ্রমের কাজ। তবু ঘরের এই ভেঙে পড়া অবস্থা, তবু বাচ্চা দুটো প্রতিদিন আশ মিটিয়ে খেতে পায়না। কিন্তু অবাক চোখে দেখো কি অন্তহীন প্রাণপ্রাচুর্যে জীবন তার ভরপুর। মুখে কী প্রাণ খোলা উদার হাসি। দিনভর পরিশ্রমের পর গভীর রাতে কেরোসিনের টেমির আলোয় নিরিবিলিতে পড়ে চলেছে পদ্মপুরাণ——

—গেল গেল ধনজন সকল আমার।
কি করিবে বল মোর পদ্মাবতী আর ॥—

কেন এ প্রাণ প্রাচুর্যের অভাব মস্ত মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসা শিক্ষিত বাবুদের, সাহেবদের, কেন তাদের চুলে পাক ধরে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় ? কেন ? কেন ? তারা প্রতিনিয়ত কৃত্রিমতার নাগ পাশে বন্দী বলে, বাধা নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ বলে, একই চক্রে জীবনভর একই গতিতে একই ভাবে ঘুরছে বলে। দেখেছি শিলং পাহাড়ে খাসিয়া শ্রমিকদের : সকালবেলা ঝোলা পিঠে নিয়ে কাজে বেরোয়, দিনভর শক্ত পাথর ভাঙে, করাত চালায়, হাতুড়ি পেটে। আর রাতে দলবেধে বাড়ি ফেরে ধীরে ধীরে হেঁটে, উঁচু গলায় হেসে, আর খোলা মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে। কিন্তু কেরানী ফিরে ত্বরিত পদক্ষেপে, বড়বাবু আর ফাইলের কেচ্ছা বলতে বলতে। আরো দেখেছি চেরাপুঞ্জীর পাহাড়ে শুধু কাঁঠাল আর আলু খেয়ে দিনের পর দিন কাজ করছে তারা কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে নাচতে নাচতে মাউথ অর্গান বাজিয়ে বাড়ি ফিরছে দলে দলে। এতো প্রাণ, এতো ঐশ্বর্য, এ গান, এতো মনের আলো ! শুধু তারা প্রকৃতির কোলের সন্তান ব'। । মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই সুললিত কাব্যনিঝ র শুনতে শুনতেই কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সোনালী রোদে ভরে গেছে মাঠ ঘাট, আম বাগান, ঝাড় জংগল সব কিছু। বাইরে শিশির ভেজা পৃথিবী থেকে চিরপরিচিত দেশের মাটির সুবাস জেগে উঠছে। জোরে শ্বাস টেনে নিলাম। দিদি এসে দাঁড়ালেন পিছনে।—কি সর্দি লেগেছে ? ঘরটায় কিছু নেইতো আর।—

—নাতো !—উৎফুল্ল বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াই আমি।—দেশে যাইনি কতদিন। এই গন্ধ। ধান, খড়, মাটি সব কিছু মিলিয়ে কেমন গন্ধ দেখছেন। কতকথা মনে পড়ে—

একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল।

নীলমণি কাজে বেরিয়ে গেছে। বেলা চড়তেই ফিরে এল আবার। এবার আমি যাব। খেয়ে দেয়ে তৈরি। বৌদির শাড়ির আঁচলের প্রান্ত দরজার পাশে দেখতে পাচ্ছি শুধু। দেখতে পেলাম না কেমন তাঁর মুখ। বাচ্চা দুটো আমি চলে যাচ্ছি বুঝতে পেরে বোবা দৃষ্টিতে শুধু আমার মুখে তাকাচ্ছে ফিরে ফিরে। ওদের বুকে জড়িয়ে ধরলাম—

দিদি আবার প্রণামের উদ্যোগ করতেই তিড়িং লাফ মারলাম। এবার প্রস্তুত ছিলাম আগে থেকেই। সিঁদুর মাখা একটি সিকি বের করলেন তিনি,—ব্রত করে বামুনকে দেব বলে প্রণামী তুলে রেখেছিলাম। পায়ে দিতে হয় প্রণামী—

বুঝলাম না নিয়ে উপায় নেই। গোলমাল বাধবার আগেই চটকরে হাত থেকে তুলে নিয়ে সিকিটা পকেটে পুরলাম।

একসঙ্গে সবকটি টিয়ে কলকলিয়ে উঠল হঠাৎ। ওরাও কি বুঝতে পেরেছে মানুষের মর্মবেদনা? এগিয়ে গিয়ে খাঁচা দুটি নেড়ে দিলাম। ছোট পাখীটি ঘাড় বেঁকিয়ে পরিচিতের মত ঠোঁট বাড়াল।

দৌড়ে ঘরে ঢুকল নীলমণি। পর মুহূর্তেই বেরিয়ে এল হাতে ছোট একটি তারের খাঁচা নিয়ে। সুকৌশলে বড় খাঁচা থেকে চঞ্চল পাখীর ছানাটিকে তুলে এনে ছোট খাঁচায় পুরল. এগিয়ে ধরল আমার দিকে—এই পাখী আমাদের কথা মনে করিয়ে দেবে!

কি সাংঘাতিক! কোন রকমেই তাদের বুঝাতে পারিনা। সব যুক্তি নিষ্ফল। নীলমণির ছোট চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠে।

—কিইবা দেবার সাধ্য আছে আমাদের। শুধু, যাতে ভুলে না যান—

ভুলবো! কেমন করে ভুলতে পারি এমনি অনাবিল ভালবাসার

মুহূর্তগুলি। কতটুকু এর ফিরিয়ে দিতে পারি! ভালবাসা অপরি-শোধ্য, আর সেখানেই তার মাহাত্ম্য।

ছুটি টাকা নিয়ে বাচ্চা ছুটির হাতে গুঁজে দিলাম, মিষ্টি কিনে খেয়ো। কিন্তু মনে মনে নিশ্চিত জানি এটাকা দিয়ে চাল কেনা হবে, নয়তো কাপড়।

টিয়ে পাখীর ছানা নতুন খাঁচায় এসে মহা কোলাহল জুড়ে দিয়েছে। ওকে সামলানো দায়। একটা যুক্তি খুঁজে পেলাম যেন,—এই দেখো, দল ছাড়া হয়ে ওর কত কষ্ট, সাথীদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে না ওর?

—তার আর কি হবে!—নীলমণি হাসে, এমনিতেই বাজারে বিক্রী করে দেব ওদের হুদিন পরে।

এমন অবস্থায় পড়িনি কোনদিন। খাঁচার ভিতরে ছোট্ট পাখী তুমুল বিদ্রোহে কলকলিয়ে উঠছে। দলছাড়া করে ওকে কেড়ে নিতে মন সরছে না কোনমতে। অথচ না নিলে বেজায় ছুঃখ পাবে ওরা। শেষ পর্যন্ত শাবকটিকে অদৃষ্টের হাতে সঁপে দিয়ে আঙুলে খাঁচাটি ঝুলিয়ে নিয়ে পা বাড়ালাম।

গাঁয়ের বাঁকে এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি ওরা তখনো আমার যাত্রা পথের দিকে তাকিয়ে। এবার প্রাণমন ভরপুর, নীলমণির আগে আগে মাঠ ভেঙে ছুটি আমি—

বার বার দিদি বলে দিয়েছেন, ফিরবার মুখে যেন ওদের দেখে যাই। জানি, জানি,—এ জীবনে আর ওদের সাথে দেখা হবেনা আমার।

কিন্তু চোখ যেখানে দেখে না, মন দেখে। বাস্তবে যাকে পাইনা, স্বপ্নে তাকে পাই—

চার

আবার সেই রেলওয়ে স্টেশন। গাড়ি, হৈ চৈ, হট্টগোল। নীলমণির শান্ত করুন মুখের দিকে চোখ ফেরাতেই হঠাৎ মন দমে গেল। দুর্বার বাসনা জাগল, থাক পড়ে থার্ডক্লাসে উত্তরাপথ ভ্রমণ, ফিরে যাই আবার দুদিনের নিরিবিলি শান্তশ্রী জীবনের কোলে। ভাবতেই চোখে ভেসে উঠল নীলমণির বাড়ি। ডুবন্ত সূর্যের কোমল স্নেহে মায়াময় পশ্চিমের মাঠ, স্নেহময়ী দিদি, অবগুণ্ঠিতা লজ্জানম্র গৃহলক্ষ্মী আর ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে, আমি উঠবার নাম করিনা।

—বাবু? নীলমণির সপ্রশ্ন কণ্ঠস্বর পিছনে জেগে উঠে। চমক ভাঙল। ঘরমুখী সুখপিয়াসী মনকে যেন গলা টিপে ধরলাম আপ্রাণ শক্তিতে। তারপর একলাফে গাড়িতে উঠে পড়লাম। জানলায় এসে দাঁড়াল নীলমণি, হাত রাখল। বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন ছাড়ল। জানলার উপর ওর হাত চেপে ধরলাম প্রগাঢ় মমতায় প্রেমে স্নেহে সহানুভূতিতে। চলন্ত ট্রেনের সাথে সাথে পা ফেলে চলেছে সে। চোখে মুখে বেদনার্ত হাসি,—এদিকে এলে আসতে ভুলবেন না কিন্তু। আমরা পথ চেয়ে থাকবো—

ট্রেনের গতি বাড়তেই পিছনে পড়ল সে। গলা বাড়িয়ে যতক্ষণ পারি কড়া রোদে দাঁড়িয়ে থাকা তার স্থির মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকি—

আঃ, কেন ওরা এতো ভাল বাসতে পারে! এতো নিবিড় ভালবাসার বেদনা আমি রাখি কোথায় বলো।

হঠাৎ মন এতো কাহিল হয়ে পড়ল যে, তাদের শত অনুরোধ ঠেলে সাত তাড়াতাড়ি চলে আসার দরুণ রাগে নিজের মাথা চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করল। চার পাশের অশিক্ষিত মলিন কুশ্রী জনতার উপর

অকারণ বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল। আমার ডান হাতের আঙুলে ঝুলানো খাঁচা দেখে কারা সকৌতূহলে কি জিগ্যেস করতেই বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে উপরে তাকালাম। এই যে, বাঙ্কের একপাশে একটু জায়গা খালি রয়েছে,—থলি আর খাঁচা উপরে তুলে আমিও লাফ দিলাম। কোনরকমে আসন করে বসে চোখ বুজলাম—আঃ—

শ্রীমান টিয়ের কলকণ্ঠে চোখ খুললাম। আগে লক্ষ্য করবার মত মনের সুস্থতা ছিলনা,—এখন দেখলাম আমার বাঙ্কের অপর প্রান্তে বসেছে শ্যামবর্ণ নাদুস নুদুস একটি ছেলে। মাথায় টুপি, গায়ে কালো পাতলা কাপড়ের কোট, পরনে সস্তা পাজামা। মানব শিশু ও পক্ষী শাবকে ভাব হয়ে গেছে এরিমধ্যে। কাগজের ঠোঙা থেকে চানা তুলে পাখীর ছানার মুখে দিচ্ছে নরম মেজাজ ছেলেটি। পৃথিবীর আর কোন খবরে হুঁস নেই তার।

—এই কাঞ্ছা, পড়ে যাবি যে!—আমার মুখোমুখি বাঙ্ক থেকে প্রৌঢ় নেপালীটি ছেলেটিকে ট্রেনের ঝাঁকুনি সম্পর্কে হুঁসিয়ার করে দিল। স্নেহশান্ত চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে বিড়ি বের করল,—'মাচিস্' আছে বাবু? একরাশ গাঠরীর উপর বসা তার রোগা লম্বাটে শরীর নড়ে চড়ে উঠল।

—নাতো!—আমি হতাশ ভঙ্গীতে তাকাই।

ততক্ষণে আমার শান্তি পিয়াসী মনকে শাসন করে বাস্তবমুখী করে এনেছি। নীলমণির ছায়াভরা গৃহশ্রীর মায়া কাটিয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে বসেছি আবার। পথের সাথীকে ভালবাসতে হবে এবার। বললাম;—দাঁড়াও, ইস্টিশন এলেই কিনছি আমি।

—না না, কেনবার দরকার কি?—আধবুড়ো লোকটা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লম্বা পায়ের পেশী ঝুলে পড়েছে। নেড়ামাথা, সরু আঙুল, জুতা বিহীন পায়ের পাতা কেটে চৌচির, নোংরা। আর কালো বিষণ্ণ মুখ, মনে হয় জন্ম দুঃখী।

—আমার নিজের জন্মেই লাগবে যে !—আমি হেসে তাকাই।

পরের স্টেশনেই কিনলাম দেশলাই। আর বিড়ি,—ভাব জমাতে হলে এর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই।

নাদুস-নুদুশ হাসিখুশি ছেলেটিকে ভাল না বেসে উপায় নেই। সরু নাক, পাতলা ঠোঁট, অবাক দৃষ্টি, ভাসাভাসা দুটি চোখ। অকারণে হাসে ছেলেটি, ওকে বাদাম কিনে দিলাম। নেবেনা কিছুতেই, বেজায় লজ্জা, শেষে ওর বাবার কথায় রাজি হল।

বন্ধুভাবে এগিয়ে এলে নেপালীদের সাথে ভাব জমাতে দেরি হয়না। আধা হিন্দী, আধা নেপালীতে পদমলাল উপাধ্যায় বললে,—তামাম নেপালের অর্ধেক লোক দেখবেন ঘুরে বেড়াচ্ছে হিন্দুস্থানে রুটির ধান্দায়, করছেনা হেন কাজ নেই। সেপাই বলুন, কুলি বলুন, পিয়ন-চাপরাশি বলুন, চৌকিদার বলুন, ব্যবসায়ী বলুন, চাকুরে বলুন, সব কিছুতে পাবেন নেপালীদের। আর ওরা খোঁজে ঠাণ্ডা জায়গা, পাহাড়ী আবহাওয়া। শিলঙ্‌ গেছেন, দার্জিলিং ? দেখবেন নেপালীদের কারবার। এই দেখুন না আমাকে, ডিগবয় থেকে আসছি। বারোদিন লাগবে বাড়ি পৌঁছুতে। বাচ্চাটার কি কষ্ট হবে তাই ভাবছি—

ট্রেনে পাঁচদিনের উপর হতে চলল। ছেলেটা কিন্তু একটুও মিইয়ে যায়নি। কিন্তু তার বাপের ওই বিষণ্ণ মুখচ্ছবির অন্তরালে কিসের বেদনা বিধুর ইতিহাস তা জানব কেমন করে ? আরো একটু অন্তরঙ্গ হওয়া চাই। বললাম,—তোমার বাঙ্কে এসে পড়ি, কি বলো। ওরা দুটি বাচ্চাতে গল্প করুক এদিকে—

বাচ্চার দিকে তাকাতেই তার বেদনা বিধুর চোখে আলো খেলে গেল। পরমুহূর্তে সে তাকালে টিয়ে পাখীর দিকে।—বেশতো, আসুন। খুব ভাল কথা—

ওরপাশে বসে বিড়ি বের করলাম। নিচে যাত্রীদের গোলমাল চরমে

উঠেছে, কানপাতা দায়।—ডিগবয়ে কাজ করো নাকি তুমি ?—নীরবে ওর জবাবের প্রতীক্ষায় রইলাম। বাচ্চাটার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে থাকে সে। সময় কেটে যায়। ট্রেনের ঝাঁকুনি আর যাত্রীদের চেঁচামেচি।

এক সময় সে মুখ খোলে। বহুবছর ধরে আসামে কাজ করছে সে। কিন্তু শেষে কোন কারণে সব কিছুর উপর ঘেন্না ধরে যাওয়াতে তার আপনার জনের শেষ চিহ্ন এই বাচ্চাটিকে নিয়ে নেপালে ফিরে গিয়েছিল সে। ভেবেছিল আর স্বদেশ ছেড়ে বেরোবে না। কিন্তু পেটের দায়ে বেরোতে হল। এক পুরোনো আত্মীয় ভাল আয় করে ডিগবয়ে। সে চাকরির ভরসা দিলে। ছেলেটিকে নিয়ে সে তাই গিয়েছিল ডিগবয়। গিয়ে শোনে বেচারী আত্মীয় টাইফয়েডে মারা গেছে হঠাৎ। এ দুঃসংবাদ শুনে আর একমুহূর্তও বিদেশে টিকতে চাইলনা মন। সে বুঝলে, এ ভগবানেরই ইঙ্গিত—তুমি দেশে ফিরে গিয়ে মরো। তোমার যে যাত্রা মৃত্যুর সংস্পর্শে শুরু হল তা তোমার ছেলের পক্ষে শুভ হবেনা। তাই থালা ঘটি বিক্রী করে চেয়ে চিন্তে কোনরকমে ভাড়া জোগাড় করে পালিয়ে এসেছে সে।

—ওঃ,—আমি যেন ওর ব্যথামলিন মুখভাব কিছুটা বঝতে পারি এবার।—এই একটি ছেলেই বুঝি তোমার—

—হুঁ।—গলায় আটকানো পৈতা সরিয়ে চুলকায় সে। আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে চোখ কুঁচকে তাকায়, যেন গভীর কোন সমস্যায় ডুব দেয়। ও কিছু একটা বলতে চায় অপরিচিত পথের সাথীকে, মনের পাষাণভার লঘু্ করতে চায় খানিকটা। বুঝে নিঝুম নির্বাক হয়ে বসে থাকি আমি, ট্রেনের দোলানীর সাথে দুলতে থাকি। বাচ্চাটা বাদাম খাচ্ছে, পাখীটার সাথে খেলছে, হাসছে খিলখিল করে—

—প্রথম যখন আসাম যাই, তখন আমি পঁচিশ বছরের নওজোয়ান।

সঙ্গে নতুন বৌ। এক কাঠের গুদামে চাকরি নিলাম। কি আরাম। একবছর পর মেয়ে হল আমাদের।—পদমলাল ওপাশের বাঙ্কে দুটি হাসিখুশি বাচ্চার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—কিন্তু দুবছর না ঘুরতেই মা মেয়ে দুজন পালাল। একটা যুদ্ধ ফেরৎ টাকাওয়ালা সেপাহির সঙ্গে। কত কাঁদলাম মেয়েটার জন্যে, কত খুঁজলাম। পেলাম না। এরপর আরো চারবার বিয়ে করেছি। কোন বৌ আমার সঙ্গে থাকেনি। সব চলে গেল। যত্ন না পেয়ে আমার চার ছেলে আর দুটি মেয়ে মারা গেল। এই ছেলেটিকেও রাক্ষুসী তার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল আমার পিছে। ওকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম নেপাল। ভেবেছিলাম আর এদেশে ফিরবোনা। কিন্তু আর নয়। এদেশে আমার যেন অভিশাপ রয়েছে। এখানে থাকলে আমার এই শেষ সম্বলও যেন বাঁচবে না, এমনি মনে হয়। জানো?—
—সে ব্যথিত দৃষ্টিতে আমার চোখে তাকালে—ওর আসামে নিয়ে যেতেই জ্বর হয়েছে। কেমন ফোলা ফোলা চেহারা দেখছো না? শুধু ভাড়ার টাকার জন্যে, নয়তো কতো আগে পালিয়ে আসতাম।—
—নিবন্ত বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে চোখ বুঁজে বসে থাকে পদমলাল। এরপর আবার বিড়বিড় করে উঠে,—তবু যে কেন ফিরে ফিরে আসি জান? যদি আমার পঁচিশ বছরের পালিয়ে যাওয়া মেয়েকে একবার দেখতে পাই কোথাও, নেপালে তো সে নয়—

চোখ বুঁজে পায়ের উপর পা তুলে বাঙ্কে বসেছে সে। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে বুকের উপর তার মাথা দুলছে। কপালের গভীর রেখায় জীবনের গ্লানি আর লাঞ্ছিত স্বপ্নের নীরব অভিব্যক্তি। হাসিখুশি বাচ্চাটার দিকে চোখ ফেরালাম। সে কি তার মায়ের বিষয় শুধায় না পদম-লালকে? সেকি জানে তার বাবার গভীর লজ্জা, মর্মবেদনা, প্রতিমুহূর্তের অন্তর্জ্বালা? আমি অবাক মানি। টিয়ে পাখীর ছানা যেন তার মনের মত সাথী পেয়েছে। কি স্বচ্ছন্দ সুনিবিড় বন্ধুত্ব দুজনের

দেখতে দেখতে হুড়মুড়িয়ে ট্রেন এসে ঢুকল গোরক্ষপুর স্টেশনে। দীর্ণ-শীর্ণ লম্বা শরীর নিয়ে নিচে নামল পদমলাল। নেড়ামাথায় টিকিট। ঠিকমত বসিয়ে টুপিটা পরল। ছোট ছেলেটিকে নিচে নামিয়ে মাথায় টুপি দিল। তারপর ইহলৌকিক সম্পত্তি এক কাপড়ের ঝোলা পিঠে বেঁধে বাঙ্ক থেকে লাঠি নামাল। বড় একটা, অন্যটা ছোট। ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে নমস্কার করল আমাকে। ছেলেকে বললে,—নমস্কার কর কাঞ্চা।

কাঞ্চার হুঁস নেই। একহাতে টুপিটা ঠিক করতে করতে উঁকি দিয়ে হাসিমুখে তাকাচ্ছে টিয়ে-ছানার দিকে। পাখীটা ঘাড় বাঁকিয়ে খাঁচার ফাঁকে ঠোঁট বাড়িয়ে যেন সহজ পুলকে ওকে কাছে ডাকছে। পদমলাল করুণ-হাসি হেসে ছেলের কাঁধে নাড়া দিলে আবার,—নমস্কার কর ওঁকে। এতক্ষণ তার পাখী নিয়ে খেললি, বাদাম খেলি—

একমুহূর্ত ভাবলাম। কাঞ্চা দ্রুবে ত্বরিতগতিতে নমস্কার করেই আবার পাখীর দিকে চোখ ফিরিয়েছে। লাফিয়ে নিচে নামলাম। বাঙ্ক থেকে খাঁচাটি তুলে কাঞ্চার হাতে দিয়ে নীলমণি আর তার দিদি আমায় যা বলেছিল ঠিক তাই বললাম তাদের। —আমায় মনে করবে তোমরা—

সেই একই ব্যাপার। আমি ওটা দেবই, আর পদমলাল নেবেনা। কাঞ্চা আবার কোলে মুখ লুকিয়ে চোরা চাউনিতে একবার আমার দিকে অন্যবার পাখীর দিকে তাকাচ্ছে। চোখে অবিশ্বাস, আশা, স্বপ্ন আর অভাবিত আনন্দের ঝিলিমিলি। গাড়ির সবাই অবাক-চোখে আমাদের কাণ্ড দেখে।

—আমি কত দেশ ঘুরব, কবে বাড়ি ফিরব ঠিকই নেই। না খেয়ে পাখীটি মারা যাবে যে—

—কিন্তু নেপালের হাওয়া সইতে পারবে না টিয়ে পাখী, পদমলাল আমারি মত যুক্তি হানে।

ঐ সবুজ মখমলের মত ডানার দিকে তাকিয়ে কে বিশ্বেস করতে

পারে এই পাখীর ছানা কোনদিন শুকিয়ে মারা যাবে? তাছাড়া ওর পাশে পাশে থাকবে সরলাত্মা কাঞ্চা তার বুকভরা ভালবাসা আর চোখভরা বিস্ময় নিয়ে, ভয় কিসের? আমি দরজার দিকে ঠেলে দিই ওদের।—যাও, গাড়ি ছাড়বে এবার।—

আরো সাতদিন পর অনেক পায়ে হেঁটে বাড়ি পৌছবে ওরা।

জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখি ওরা প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে চলেছে। সামনে দীর্ঘদেহী অবসন্ন বিষাদগ্রস্ত চিরদুঃখী পদমলাল। হয়তো কোন অখ্যাত চাপরাশী কি চৌকীদার। হাতে মস্ত কাঠের লাঠি, পিঠে বাঁধা ঝোলা, খালি পা, মাথায় তেল-মলিন টুপি। আর পিছনে? আহা, কাঞ্চা থপ্ থপ্ পা ফেলে চলেছে, ডানহাতে তার বাপের তুলে দেওয়া লাঠি, আর বাঁ-হাতে খাঁচা, প্রায় নাকের সামনে তুলে ধরেছে পাখীটিকে। এতদূর থেকেও যেন দেখতে পাচ্ছি তার সরল-বুদ্ধি মুখ অভাবিত সৌভাগ্যের আলোয় ঝলমল, আর বড় বড় চোখ দুটি নিবিড় পুলকে ভালবাসায় ছলছল। প্রতিপদে হোঁচট খাচ্ছে কাঞ্চা। তার বাবা থমকে দাঁড়াচ্ছে আর তাড়া দিচ্ছে কাঁধ নেড়ে—

কত সুদীর্ঘ কষ্টদায়ক দিন-রজনীর পথ সামনে পড়ে—এই বয়সেই ছেলেকে পথচলার তালিম দিচ্ছে পদমলালরা। কাঞ্চার নীরব নিঃসঙ্গ যাত্রাপথ যদি সরস হয়ে উঠে একটু, তবে এর চেয়ে বড় সার্থকতা নীলমণির টিয়ে পাখীর আর কি হতে পারে—

যতই আশাবাদী হইনা কেন, এও স্থির জানি, যদি বেঁচে থাকে, তবে কাঞ্চা একদিন হিন্দুস্থানে ফিরে আসবে। চাপরাশী চৌকীদার কিছু একটা হবে। আমি বাবুর জাত, সেদিন হয়তো তাকে দেখেও চিনতে পারব না। কিন্তু যতদিন পারে সবুজ সুন্দর টিয়ে পাখী কাঞ্চার হিংসা-দোষশূন্য প্রেমঘন বুকে বেঁচে থাকুক—

অতি ধীরে ওরা দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেল।—

—চিরতরে।

পাঁচ

শীত করছে। কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে শরীর। আর নিচে বসে থাকা নয়, আবার বাঙ্কে উঠে আসন করে বসলাম। এবার উপর থেকে নিচের কার্যকলাপ দেখা যাবে বেশ। পুরানো যাত্রী প্রায় সবাই নেমে গেছে। ভোল বদলে নিয়েছে গাড়ি। আবার নিচে দুটি বেঞ্চ জুড়ে বসেছে থলথলে ভুঁড়ি আর টসটসে মুখ নিয়ে শেঠজীর দল। চড়া গলায় আলাপ চলছে আটা-তেল-ডাল আর ভুসি মালের দর নিয়ে। ট্রেন ছাড়ল। কিন্তু গাড়ির চাকার গর্জন ছাড়িয়েও উঠেছে পয়সা-লোভী শেঠদের গলাবাজি। শুধু চিন্তা কি করে ছলে-বলে-কৌশলে দুটো পয়সা বেশি আদায় করা যায়।

বেশ আছে ওরা। রাধার কানু বিনা গীত নাই, কেরানীর সাহেব-ফাইল ছাড়া বিষয়বস্তু নাই, ছাত্রদের সিনেমা-ফুটবল-ক্রিকেট ছাড়া চিন্তা নাই, আর হাজার হাজার শেঠজীরা তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে শুধু ভাবছে দুটো পয়সা বাড়তি মুনাফার কথা। খাঁটি কথা বলতে গেলে ওরা আমার দুচক্ষের বিষ।

তাই দূরে তাকালাম। ওদিকে আসর জাঁকিয়ে বসেছে দেহাতি মানুষ। রুটির আর সংসারের সুখ-দুঃখের চিন্তায় মন যাদের অবসন্ন। দরজার সামনে চাপ বেঁধে দাঁড়িয়েছে তারা।

আর ঠিক বাথরুমের দরজায় শীতে জড়োসড়ো চাদর-মুড়ি দিয়ে বসেছে এক বুড়ি। যে ভিতরে ঢুকতে চাইছে তাকেই অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছে। কি গলা! মুনাফা-লোভী শেঠজীদেরও হার মানিয়ে দেয়। ওর পিঠে পা ছুঁয়ে বাথরুমে ঢুকছিল একজন অনন্যোপায় হয়ে। গাড়ি কাঁপিয়ে ঝগড়া শুরু করল বুড়ি। কানে আঙুল দেবার জোগাড়। শেষ পর্যন্ত গাড়ির সবাই রুখে দাঁড়াল,—হয় সরে এসো দরজা থেকে, নয়তো গায়ে পা ঠেকলে বকতে পারবে না।

—একজন রেগে বললে,—খারাপ কথা বলবে তো গলা টিপে দেবো। বটে! এবার বুড়ি হাত-পা নেড়ে গলা সপ্তমে তুলে কান্না শুরু করলে, —ওরে বুঁধিয়া!—রীতিমত কথাকলি নৃত্য, গীত সহযোগে। জীবিত বা মৃত বুঁধিয়া নামধারী প্রাণীটির জন্যে রীতিমত অনুকম্পা বোধ করলাম।

শৈশবে আমাদের একটি হাড়-জিরজিরে অজস্র জোড়াতালি দেওয়া গ্রামোফোন ছিল। হাসি-জাগানো নাকি সুরের আওয়াজ বেরোত সেটা থেকে। চুরি গেছে বেচারি বহু আগেই। হঠাৎ বহুদিনের ভুলে-যাওয়া সেই সুর শুনে সচমকে নিচে তাকালাম। বিচিত্র এক মূর্তি কোন ফাঁকে উঠে এসেছে গাড়িতে। পরনে কালো হাফ্‌প্যান্ট, গায়ে মাথায় জড়ানো গাঢ় সবুজ চাদর। চোখে কালো ফ্রেমে বাঁধানো চশমা, চোখ ছাড়িয়ে ছোট্ট কপালের মাঝখান পর্যন্ত উঠে গেছে কাচের সীমানা। বেঁটে। কুচকুচে কালো রঙ। ছোট চ্যাপ্টা নাক। হাতে খোলা রংচটা টিনের স্যুটকেশ। আর মুখে আমার সেই নিরুদ্দিষ্ট গ্রামোফোনের মত চিঁহি-চিঁহি আওয়াজ। অজস্র বুলি।—ক্যানভাসার। কথার তোড়ে তিনটি নকল দাঁত ঝুলে ঝুলে পড়ছে বার বার, তার ফাঁকে থুতুর ফোয়ারা।

ব্যাটা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। গলা ফুলিয়ে লাল-জিব বের করে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে কথা বলে যেতে লাগল সে। ভাবার্থ হলো, দুনিয়ার তাবৎ অসুখের জন্যে ওষুধ রয়েছে একমাত্র তার কাছে। তারপর সে সবার চোখে-কপালে মাথা-ব্যথার মলম ঘসে দিতে লাগল। বেঞ্চে উঠে আমার চোখেও একগাদা মলম লেপ্‌টে দিল। জ্বালা করে উঠল। চোখ ফেটে জল বেরোল।

—পয়সা লাগবে না? চোখ মুছতে মুছতে শুধাই।

—এইটুকুর জন্যে পয়সা আবার!—সবুজ চাদর-ঢাকা বেঁটে মূর্তি অবজ্ঞায় হাসল।—দোকানদার নই, কেম্বাসার! কেম্বাসার!

তিন পুরুষ ধরে কেম্বাসার আমরা! তা, কিনুন এক কৌটা, এঁ্যা?—

সে নাকি-স্বরে কাঁদুনি গাইতে গাইতে গাড়িময় লোকের গায়ে-মাথায় পা মাড়িয়ে ঘুরে বেড়িয়ে ঔষধ বিক্রি করতে লাগল।—এই গজচূর্ণ দিয়ে দাঁত মাজলে ঘাটের মড়ারও দাঁত গজাবে নতুন করে। ডাঃ মিশ্রের এই আই-লোশন্ চোখে মাখলে ধৃতরাষ্ট্রও দৃষ্টি ফিরে পাবে।

—তা তোমার নিজের দাঁত ও চোখ সামলাও তো আগে।—থুথ্‌ড়ে এক বুড়োর দুই চোখকে সাদা মলমের তলায় কবর দিয়ে বসেছে কেম্বাসার সাহেব। দরদর ধারে বুড়োর চোখ থেকে জল ঝরছে। চাদরের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে কাঁপা গলায় বুড়ো বিদ্রূপ করে ওঠে, —ও আমার সাধের কেম্বাসার সাহেব! নিজের দাঁত যে ঠক ঠক করছে বাবা। এঁ্যা?

—আরে, ময়রায় সন্দেশ খায় না!' বুঝলে বুড়া?—সে আকর্ণ হাসে। কুচকুচে কালো মুখে সাদা দাঁত ঝিলিক মারে!—এ সব তোমাদের জন্যেই করছি,—বলতে বলতে বেচারি গিয়ে পড়ল ঝগড়াটে বুড়ির খপ্পরে। তুমুল কাণ্ড। বুড়ির চোখে যাণ্ডা মলম মাখিয়ে দিয়েছিল বেচারি, প্রায় মার খাবার জোগাড়। স্টেশনে গাড়ি থামতেই নিমেষে জানলা গলিয়ে উধাও হয়ে যায় সে—

স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাই বুড়ির কথাকলি আর থামে না। সব যাত্রীদের অকথ্য গালিগালাজ দিচ্ছে আর কাঁদছে,—ও বুধিয়া! দেখে যারে! আমার চোখে বিষ মাখিয়ে জ্বলিয়ে দিয়েছে রে, ওরে বুঁধিয়া—!—

গোণ্ডা স্টেশনে হুড়মুড়িয়ে উঠল একপাল মুণ্ডিত মস্তক পুরুষ আর পালে পালে বিধবা রমণী। কি কাণ্ড! শ্বাসরোধ হয়ে মারা যাব যে সবাই! কে শোনে কার কথা। একজন যেই "রামাইয়ারে, ইধার" বলে তারস্বরে প্রাণঘাতী হাঁক মেরেছে, অমনি পতঙ্গ যেমন বাতিকে ছেঁকে

ধরে তেমনি ওরা আমাদের গাড়িকে নিমেষে দখল করে বসল। প্রমাদ গণলাম। আশে-পাশে ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকে চাই শুধু চকচকে সদ্য-কামানো নেড়ামাথা আর বিধবা মূর্তি। তুমুল হট্টগোলের মাঝেই গাড়ি ছাড়ল। ভিতরে যেন দ্বিতীয় কুম্ভ-ট্র্যাজেডীর রিহার্স্যাল চলছে তখন।

সামনের বাঙ্কে গোটা চারেক নেড়ামাথা ঝিলিক মারছে। কোনরকমে পা মুড়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছি। আমার বাঙ্কও নেড়ামাথায় ছেয়ে গেছে। এদেরও বিড়ি দেবো কিনা ভাবছি এমন সময় এক নেড়া শুধালে,—

—আপ কিধার ?

—লখ্‌নৌ !—আপ ?

—মথুরা। তীর্থ-দর্শন।—নেড়া সন্দেহ-কুঞ্চিত দৃষ্টিতে আগাগোড়া নিরীক্ষণ করলে একবার, তারপর সটান হাত পাতলে,—বিড়ি ?

—আঃ, বাঁচলাম ! তাহলে আলাপ জমবে ভরসা হচ্ছে। বাণ্ডিল এগিয়ে দিয়ে বললাম,—পিয়ো !—সব কটি নেড়া লোলুপ হাত বাড়িয়ে এগোল। সন্দেহ-দৃষ্টিতে আমায় অভিসিঞ্চিত করলে। প্রধান নেড়া জানালে, আজ প্রায় একমাস ওরা তীর্থে বেরিয়েছে। আসছে গ্রীষ্মে বদ্রীনাথ যাবার বাসনা। এর আগে পর্যন্ত তীর্থে তীর্থে ঘুরবে। দলে নাকি হরেক রকম লোক, বাঙ্গালীভি আছে, ওই যারা শুভ্রবসনা অবগুণ্ঠিতা বিধবা। আর তাদের ঘরবাড়ি ? রামজী জানে। পঞ্ছী আর দরবেশের ঘর বলে কিছু নেই। যখন যে ডালে বসল তাই পঞ্ছী বা পাখীর বাসা—

বাঃ, অতি উত্তম। সেই যে কথা আছে,—যার নিজের নৌকা নেই, দুনিয়ার সব নৌকাই তার—

এতক্ষণ দরজার কাছের পুঁটুলীবুড়ির কথা ভুলেছিলাম নেড়াদের

আক্রমণে। এবার বুঝলাম সে জাগছে। প্রথমে জায়গা নিয়ে কথা কাটাকাটি, তারপরে তারস্বরে গালাগালি সাপাসাপি ঃ ও হাড়-হাভাতে মাগী, মুয়ে আগুন, ঘরখাগী, সোয়ামী পুত্তুরখাগী অলপ্পেয়ে মাগী—

আরে, এতো দেখছি খাঁটি বাংলাদেশের মাল। উঁকি দিয়ে দেখতে গেলাম। চাইকি সুবিধা মনে হলে মাসি বলে একটা পানও চেয়ে বসতে পারি। দেড়হাত ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচ চলছে মাসির, কালোবরণ হাত সাপের ফণার মত তড়িৎবেগে উঠছে নামছে ঘুরছে। বুড়ি তার রাষ্ট্রভাষার গালি উজাড় করেও গতিময় বাংলা ভাষার সঙ্গে পেরে উঠছে না। বুড়ির লাঞ্ছনা দেখে যাত্রীরা এতক্ষণে তৃপ্তমুখে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। হাঁা, নেড়ার কথাই ঠিক। দলে বাঙ্গালীভি আছে। ঝগড়ার কম্পিটিশনে অগ্রবর্তিনী মাসির গৌরবে আমার ত্রিশ ইঞ্চি বুক ফুলে ফুলে উঠছে হাড্ডির বাধা ঠেলে।

আধঘণ্টা পরেও যখন ঝগড়ার গতি অপরিবর্তিত রইল, তখন প্রধান নেড়াপঞ্জীকে শুধালাম,—তোমাদের দলের মাইজীকে থামিয়ে দিচ্ছ না কেন?

নেড়াশ্রেষ্ঠ হাসলে। নিতান্ত নির্মল মুখজোড়া হাসি।—কি যে বলেন, থামিয়ে দেবো! প্রতিদিন ওরা নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি করে মরছে, আজ বাইরের মাগী একটাকে পেয়েছে, ওটার উপর দিয়েই যাক। আরে ভেইয়া, যঁহা চার বাসন হোঁগে ওহাঁ খড়কোগ ভি,—তারপর একটু থেমে জানিয়ে দিলে, গৌরবমিশ্রিত বিনয়ে,—উ বাঙ্গালী হ্যায়! মাসির বিজয়ী কণ্ঠ যেন বাংলা ভাষার নতুন দিগ্বিজয় যাত্রার ঘোষণা করছে।—ও পাড়াখাগী মাগীলো, মুয়ে আগুন! তোর মুয়ে ঝেঁটা মারি, ওলো ইত্যাদি ইত্যাদি—

বুঝলাম এই মুত্তকণ্ঠের সংলাপ অথবা আবহ সংগীত যাই বলনা কেন

সারা যাত্রা-পথে ওদের ইন্ধন জোগাবে। চিন্তা বৃথা। অতএব নেড়ার দিকে নজর দাও।

নেড়ার দল লাই পেয়েছে। আবার কয়েকটি লোভীহাত আমার নাকের ডগায় লাগিয়ে তাড়া দিলে তারা,—বিড়ি?

পকেট হাতড়ে তিনটি বিড়ি পেলাম। তাই ওদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠলাম,—খতম্!

আমার বিড়ির ভাণ্ডার শেষ করে নেড়ার দল তাদের পুঁটুলী খুলে কল্কে বের করে সাজতে লাগল। শেঠজীরা স্তব্ধবিস্ময়ে ওদের দেখছে। তারাও নেড়াদের আধিপত্যে কাবু! শুধু আমাদের হয়ে ঝগড়াটে বুড়ি অসীম প্রতাপে বাঙালী মাসির সঙ্গে তখনো সমান পাল্লায় ঝগড়া করে চলেছে,—আরে, তেরা লাড়কা জিনুকা বেটা হোগা, এ বুড়িয়া—বারওয়াল স্টেশনে উঠল এসে এক "টিট্টি" বাবু। নেড়ার দল অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলে। এক মিনিটেই নেড়াদের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। একটা হতচ্ছাড়ারও টিকিট নেই। এঁ্যা, টিকিট ছাড়া পঙ্গপালের দল এতক্ষণ আমাদের কি জ্বালাতনই না দিলে! পাকাচুল এক শেঠজী বললে "টিট্টি" বাবুকে,—বাবুজী, আপনারা এতক্ষণ এলেন না, ব্যাটারা ঝগড়ায় আর চাপে সবাইকে আধ-মরা করে ছাড়লে—

টিট্টিবাবু হাসলে।—ম্যয় ক্যা কঁরু। শীত পড়তেই শত শত নেড়া আর বিধবার দল তীর্থে বেরিয়ে পড়েছে। গাড়ির টিকিট করবে না, ধরে ধরে কোন ইস্টিশনে নামিয়ে দেই আমরা। ওদের আপত্তি নেই, আবার এক সময় টুপ করে উঠে পড়বে। এমনি তামাম হিন্দুস্থানের সব তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে হতচ্ছাড়ারা। দোকানে গিয়ে দলবেঁধে খাবে, পয়সা দেবে না। বলবে, ভগবানের নাম করে বেরিয়ে পড়েছি তীর্থে, আমাদের খাইয়ে ভগবানকে খুশি রাখো। আর কি বজ্জাত ওদের মেয়েগুলো! কথায় কথায় চড় কসিয়ে দেয়। দেখবেন, টিকিট চাইলে এখনি আমাকে মারতে আসবে—

তা বটে। তখনো মাসির কাংস-নিন্দিত স্বরের ইন্দ্রজাল চলন্ত ট্রেনের গম্‌গম্‌ আওয়াজকে ছাপিয়ে কান ঝালাপালা করছে আমাদের---

নেড়ার দল নির্বিকার, শুনেও যেন শুনছে না কিছুই। দিব্যি কল্‌কে টানছে, হলদে দাঁতের মাড়ি বের করে অসহ্য হাসি হাসছে। গুণগুণিয়ে একটা গান গাইছেঃ হায় রামা, হায়! টিটিবাবু চোখ কুঁচকে তাকাচ্ছে বারবার।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই জানলা গলিয়ে নামল টিটিবাবু। ফিরল একটু বাদেই। একা নয়। রীতিমত রেলকর্মচারীদের এক পল্টন। প্রায় দশ মিনিট ধরে গাড়ির ভিতরে নেড়া ও বিধবাদের সঙ্গে ওদের যে খণ্ড যুদ্ধ চলল তার বর্ণনা দেওয়া সাধ্যাতীত। গোটা কুড়ি নেড়া ও দশটি বিধবাকে বন্দী করে ওরা গাড়ি থেকে নেমে হাঁপাতে লাগল। মাসি নামবার সময় পথের সাথী তার ক্ষণিকের সই পুঁটুলী-বুড়িকে ঠোঁটে প্রচণ্ড এক ঠোকর বসিয়ে এক লাফে নেমে গেল,---মুয়ে আগুন পড়ার মুখী!

গাড়ি ছাড়ল। সবাই জানলা দিয়ে গলাবাড়িয়ে দেখছি। প্লাটফর্ম ভরে গেছে কৌতূহলী জনতায়, ভিড়ের মাঝখানে চকচক করে উঠছে রাশি রাশি নেড়া মাথা।

আর তার যুগ যুগ সঞ্চিত গালির ভাণ্ডার উজাড় করে উচ্চতম পর্দায় গলা তুলে গালি দিচ্ছে পুঁটুলী বুড়ি। উঠে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে, বাইরে হাত বাড়িয়ে অদৃশ্য শত্রুর মাথায় ঠোকর মেরে অভিসম্পাত দিচ্ছে রাষ্ট্রভাষায়—ভগমান তেরা মরদকে চাকু মারে-

হঠাৎ বুড়িকে যেন বড় আপনার মনে হল। যেন আমরা সবাই একই পরিবারের। এতক্ষণ অনাহূত অতিথির জ্বালায় জর্জরিত হচ্ছিলাম। আর আমাদের হয়ে ওই জটাই বুড়ি বাঙালী মাসির সব গলাবাজি সয়ে গেছে এতক্ষণ। আহা, শত ঝগড়াটে হলেও সর্বংসহা মায়ের

জাত ! একজন বেঞ্চ ছেড়ে উঠে তার জায়গায় বুড়িকে বসতে বলল স্নেহমাখা করুণায়,—বস বুড়িমা !

জটাই বুড়ি কাঁথাটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে জানলার বাইরে মাথাটা আরেকটু ঠেলে দিল। রূপার মল-পরা উল্কি আঁকা হাত মুঠো করে বাঙালী মাসির উদ্দেশে তার বক্তব্য নিবেদন করতে লাগল অপরিমিত উৎসাহে,—

হাল ছেড়ে দিয়ে আমরা বসে রইলাম—

—আঃ, বাঁচা গেল।—নিচে থেকে এক শেঠজী দীর্ঘশ্বাসে বলে উঠল,

—দুই মহাবীর এক মুল্লুকে থাকার কথা নয়। এ্যাঁ ? সেই যে বলে,—এক স্থানমে দো তলওয়ারে নঁহী সমা সক্তী,—বলেই থলথলে ভুঁড়ির প্রচণ্ড হাস্যরোল।

—লেকিন ভাই,—অন্য শেঠজী ফোঁড়ন কাটে,—এক হাত সে তালি নঁহী বজ সক্তী,—

কিন্তু তখন এক হাতেই প্রচণ্ড তালি বেজে চলেছে। বুড়ি বকে চলেছে গলা সপ্তমে তুলে—

রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই কখন চোখ ভরে ঘুম এল বলতে পারি না আমি। হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখি সবাই ঢুলছে, আবার প্রচণ্ড ভিড় গাড়ির ভিতর। দরজার কাছে চাপ বাঁধা মানুষ। সেই কাটিহারের অবর্ণনীয় ভিড়। আমার বাঙ্কের নিচের বেঞ্চিতে এক শেঠজী হেঁড়ে-গলায় গান ধরেছে। তারই ধ্বনি শুনে তবে আমার ঘুম ভেঙেছে বুঝতে পারি। ইচ্ছে হচ্ছিল গলাটা টিপে ধরি ব্যাটার। অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভেবে নিঝুম বসে রইলাম।

আমার মুখোমুখি দুহাত দূরের ছোট বাঙ্কে দেখি পরিপাটি করে সুন্দর

এক বিছনা সাজানো। পুঁটুলী, ভাঙা বাক্স আর লোটা হাঁড়িকুড়ির রাশ একদিকে বোঝাই করে সরিয়ে পাতা হয়েছে সেই বিছানা। কে এল আবার ? নিচে তাকিয়ে দেখি শেঠজীদের উল্টোদিকের বেঞ্চে এসে বসেছে একটি জীব। জীব বটে ! ওজন ? তা ধরো চার মণের উপর। রঙ ? রূপকথার রাজকন্যের মতই দুধে-আলতায় মেশানো। লালচে টকটকে রঙ। মাথাতো নয় যেন ধামা। বেঞ্চের অর্ধেক জুড়ে তার লাশ ছড়ানো। ঝোলা প্যাণ্ট-কোট গায়ে। এলো মেলো চুল সামনের দিকে নেমেছে। আর এতো বিরস-বদন মানুষ পৃথিবীতে খুব কম খুঁজে পাবে তুমি। চার্লি চ্যাপলিন সামনে এলেও বোধ হয় সে হাসবে না। যেন চব্বিশ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন কুইনাইন গিলছে সে, এমনি বিরস বিতৃষ্ণায় কুঞ্চিত তার থলথলে লালচে মুখ। গলা বলতে কিছু নেই। ঘাড়-গর্দান এক। বিকটাকার মূর্তি। মস্ত ধ্যাবড়া নাক। বদরাগী দুই ভীষণ চোখ। বাচ্চারা ওকে দেখলে নির্ঘাৎ ভিরমি যাবে। সে যেন গোটা বিশ্ব-সংসারের গার্জেন, সবার সেরা সমজদার সে। ছেলে ছোকরাদের নষ্টামী দেখে দেখে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় তার কপাল কুঁচকে গেছে, নাক সিটকে গেছে। সেই বিরস বদনের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে ভরসা হয় না। ঘাড় হেলিয়ে চরম বিতৃষ্ণায় ও অবহেলায় লাল টুকটুক মুখখানাকে বিষাক্ত কুৎসিৎ করে সে বই পড়ছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম। ডিটেকটিভ নভেল নয় ইংরেজী কবিতার বই !

কিন্তু বেচারি বিছানাটা পাতল কেন উপরে ? এই বপু নিয়ে বাঙ্কে উঠবে সে ? হায় রে !

হঠাৎ করুণায় ভরে গেল মন। ওই বিরস বদন, ঘৃণা অবহেলা বিতৃষ্ণায় বিষাক্ত মুখ লোকটির জন্যে করুণা। এতো অসম্ভব মোটা সে, যেদিকে যাবে লোকে হাসবে, বিদ্রূপ করবে। ছেলেরা ঢিল ছুঁড়বে। সে রোগা হবার স্বপ্ন দেখে। যেমন আমি দেখি মোটা

হবার। তাই অমন সাধ করে বাঙ্কের উপর সযত্নে বিছানা সাজিয়ে রাখে! সে কল্পনায় দেখে, এমন সুদিন আসবে যেদিন সে তড়াক করে লাফিয়ে বাঙ্কে উঠতে পারবে। বিছানাটা ততদিন সাজানো থাক—

কিন্তু সে ভরসা পেলাম কই? এরপর কবিতার বই সরিয়ে রেখে সাঁইয়া পালোয়ান এক টিফিন কেরিয়ার খুলে খাবারদের আক্রমণ করল। বাঘকে মাংস খেতে দেখেছো? অনেকটা সেই রকম ব্যাপার। হৈ হৈ ব্যাপার, হুস্ হুস্ শব্দ, নিস্তব্ধ গাড়িতে বসে বসে এই কাণ্ড করছে সে সবাইর দৃষ্টি লুকিয়ে। কয়েক মিনিটেই প্রায় আমার মত দশজনের খাবার তার বিরাট পেটে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্তে হেলান দিয়ে বসল সে। আর সেই মুহূর্তেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি! কেমন আরামে পা-গুটিয়ে সরু বাঙ্কে বসে আছি আমি তার চারভাগের এক ভাগ ওজনের শরীর নিয়ে! হিংসা দ্বেষ ঘৃণা এক সাথে তার ভীষণ চোখে ঝলসে উঠল।

শেঠজীর গান অথবা আর্তনাদ যাই বলো মিনিটের পর মিনিট চলতে লাগল। চোখ বুঁজে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলাম শুধু। সহসা শেঠজীর বেসুরো আর্তনাদ, বুড়ির বক্‌বকানি আর গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে ভেসে উঠল সুমধুর সুতীক্ষ্ণ এক সুর লহরী। ঠিক আমারি নিচে। বাঁশীর মত গলা, সতেজ, প্রাণ মাতানো। পরম নিশ্চিন্তে উঠা নামা করছে সুর, কোন ছেদ নেই কোথাও। একসাথে বিস্ময়ে সবাই চুপ করল। সঙ্গে সঙ্গে নুয়ে নিচে তাকালাম। সবুজ হাফ্‌সার্ট গায়ে, হাঁটুর উপর ধুতি, খালি পা,—অতি সাধারণ এক পথের মানুষ। কোনক্রমে শেঠজীদের মাঝখানে বসতে পেরেছে শুধু, হাত রাখবার ঠাঁই নেই। উপরে দুই হাততুলে আমার বাঙ্কের ফাঁকে আঙুল গলিয়ে অতিকষ্টে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখছে সে।

কিন্তু কী সুর, কী গান, কী প্রাণ আকুল করা ধ্বনি। গানের কথা

মনে নেই কিছুই,—সুবল রে, তু না গেলি যমুনাকি পার ! —এমনিধারা একটি লাইন শুধু মনে পড়ছে। সম্ভবত মৈথিলী লোকসংগীত। কি জানি। কিন্তু নিঝুম রাতের বুক চিরে সব যান্ত্রিক কোলাহল ছাপিয়ে নিচ থেকে উপরে ভেসে এলো যে সুর নির্ঝর, তার মায়াজালে আমি সব চেতনা হারালাম নিমেষে।

গ্রামের পথে খাটি বাউলের গান শুনেছো কখনো কোনদিন, আপন-ভোলা বৈরাগীর আপন মনে গান ? আমি শুনেছি। এ কেমন বর্ণনায় বোঝানো যায় না। রেডিও গ্রামোফোন সংগীতের আসরে যে গান শোন সে হল নিখুঁত নিওনের আলো কিন্তু এ হচ্ছে গ্রামের উদাসী মাঠে ঝোপ ঝাড় বিলে নিশুতি রাতের চাঁদের আলো। যেন এক স্বপ্ন, নিবিড় অচিন্ত্যনীয় এক প্রেমানুভূতি—

সবাই চোখ-মেলে নিঃশব্দে সেই সুরধারায় যেন আকণ্ঠ অবগাহন করছে। মন্ত্র মুগ্ধের মতন। শুধু তারই হুঁস নেই, তেমনি পায়ের উপর পা তুলে উর্ধ্ববাহু হয়ে চোখ বুজে কোন গভীর আবেগে চিরন্তন বিরহ বেদনার গান গাইছে সে,—সুবল রে ! তু না গেলি যমুনাকি পার ! —মাইক সর্বস্ব আধুনিক কালের মিনমিনে গলার গায়ক নয়। দরাজ সুতীক্ষ্ণ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

গান থেমে গেল, কিন্তু সূর্যাস্তের শেষে অস্তরাগের মত সুরের ইন্দ্রজাল যেন অনুভূতির আকাশ রাঙিয়ে চলেছে। আধো অন্ধকার এক ইস্টিশনে এসে কখন গাড়ি থামল বলতেই পারি না।

—যায়েগা ভাই ?—নিচের আলাপে চমক ভাঙল। উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। অতি সাধারণ, অতি পরিচিত এক দেহাতী মানুষ। লক্ষ জনের মতই একজন। অখ্যাত, সুলভ, শ্রমজীবি একটি লোক।

—হ্যাঁ ভাই, বলে তার পুঁটুলী বগলে নিয়ে নিমেষে জানলা গলিয়ে বাইরের অন্ধকারে নেমে গেল সে—

প্রকৃতির অকুণ্ঠ দান যার কণ্ঠে সুরের প্লাবন এনে দেয় অমন অপরূপ

লীলায়, আমি জানি সে এই মাটির বুকে গায়ক হয়ে টিকে থাকবে না, সম্মান পাবে না। সে হবে কুলী, মিস্ত্রী, নয়তো মাঠের শ্রমিক, যার মালিকের কাছে তার কণ্ঠ সম্পদের কোন মূল্য নেই, শুধু তার হাতের শক্তির উপরই তার বেঁচে থাকা নির্ভর করবে—
কে বলে মিয়া তানসেন আর জন্মায়নি! জন্মেছে, যুগে যুগে। শুধু নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিক তার সুরেলা কণ্ঠ প্রয়োজনের শক্ত মুঠিতে টিপে থেঁতলে দিচ্ছে বারবার।

আহা,—কর্তব্য আর প্রয়োজনের অজস্র উত্তাপের মাঝখানে কেমন করে আমার সবুজ স্বপ্নের, অতলস্পর্শ কল্পনার সুরভিত মালা সজীব রাখবো!
—ইস্টিশানের নাম কি, সাথী?—নুয়ে শেঠজীকে শুধাই—
বাইরের আবছা অন্ধকারে নগন্য ইস্টিশানের নামের খোঁজে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে শেঠজী, ব্যর্থ নিশ্বাসে বলে উঠে,—মালুম নেহি হ্যায়—
এক মহান অজ্ঞাত শিল্পী একঝলকের জন্যে ভেসে উঠেই আবার অখ্যাতির চির অন্ধকারে ডুব দিল—

মনে পড়ল আরেক জনের কথা। ভারতের রেল গাড়ির থার্ড ক্লাশে আর ইস্টিশানে প্ল্যাটফর্মে প্রায়ই দেখতে পাবে অখ্যাত অবজ্ঞাত কিন্তু গুণী গ্রাম্য কবিকে, গায়ককে। হাত পেতে দুপয়সা চারপয়সা ভিক্ষা মাগে তারা। গান গায়, মুখে মুখে অনর্গল স্বরচিত কবিতা আউড়ে চলে। দক্ষিণ আসাম পূর্ববাংলার সীমান্তের নিয়মিত রেল যাত্রারা সবাই চেনে এমনি এক বাঙালী মুসলমান কবিকে, রেলগাড়িতে কবিতা শুনিয়ে পয়সা রোজগার তার একমাত্র জীবিকা। হয়তো কেউ প্যান্ট পরে গলায় কম্ফটার জড়িয়ে বসে আছে, সে এগোবে, মুখে মুখে কবিতা বলে যাবে—

বাবু তুমি বইস্যা আছো গলায় দিয়া টাই,
আমার কিন্তু খাইবার লাগি একটি পয়সা চাই।

এর পরে বাবুর পয়সা না দিয়ে উপায় কই ?

নয়তো বলবে—

ছোট ছেলে বাঘরে ডরায়
আমি ডরাই কারে ?
ওই যাদের বহুৎ আছে
পয়সাটা দেয়না মোরে।

এমনি মুখে মুখে কবিতা রচনা চলে তার। হয়তো কেউ ঘাড় শক্ত করে অবজ্ঞায় মুখ বেঁকিয়ে একটি পয়সা না দিয়ে উঠে যাচ্ছে, অমনি কবি লাফিয়ে উঠবে গাড়ি কাঁপিয়ে—

শোনোবা বাপের বেটা, কোথায় চলি যাও,
ওই যে আমি পয়সা দেই, মুড়ি কিইন্যা খাও।

সেই অঞ্চলের সবাই চেনে তাকে। আজকাল অনেকের মুখে মুখে রেলগাড়ির কবিতা ছড়িয়ে পড়ছে শহরে গ্রামে। যে কবি হয়ে জন্মেছে তার যে কবি হয়ে না বেঁচে উপায় নেই! তা সে ছোটভাবেই বাঁচুক আর বড় ভাবেই বাঁচুক। তেমনি গাড়িতে গান গেয়ে বেড়ায় কত সুরেলা গলার গায়ক, কোথাও বা গায়িকা। কেউ কেউ অসহ্য রীতিমত, মহা বিরক্তিকর উৎপাত। কিন্তু কারো কারো গান একবার শুনলে বারবার শুনতে চাইবে তুমি। এই যেমন একজন এই মাত্র গেয়ে গেল—যার সুরের মায়ায় শ্রবণ ভরে উঠেছে।

আর গানের ইন্দ্রজাল সরে যেতেই ক্ষুধার কালো ছায়ায় আমার একশো পাউণ্ডের শরীর ঝিমিয়ে পড়ল। আর পারছিনা। নিচে নেমে খাদ্যের খোঁজ নিতে হচ্ছে এবার। টুপ করে আমার পালকের মত পাতলা শরীর নিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়লাম। একেবারে চারমণি মোটার গা ঘেঁসে। সর্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর চোখে তাকাচ্ছে সে!

উপরের বাঙ্কে তখনো তার বিছানা সাজানো। ওর চোখে চোখে তাকিয়ে রইলাম এক মুহূর্ত। অতি কুৎসিৎ কোন পণের প্রার্থিনী মেয়ে তার সামনে সহসা কোন তন্বী রূপসাকে দেখে যে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকায়, সেই সর্বনাশা দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার চোখে। দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজা আগলে সুদীর্ঘ ঝগড়ার পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত জটাই বুড়ি কাঁথা মুড়ি দিয়ে পুঁটুলী সেজে বসে আছে চুপচাপ।

—ও বুড়িমা, যেতে দেবে?—ওর কাপড় ঢাকা মাথাটা ঠেলে দিলাম একটু। মহা বিরক্তিতে চোখ তুলে তাকালে সে, তারপর নীরবে আমার চোখে চোখ রেখে তার পুঁটুলী ঘেঁটে একটুকরো কাগজ বের করে শান্ত সুরে বললে,—সরবো? বিনা টিকিটে যাচ্ছি, ওই বদমাস বেটাদের আর নেড়াদের মত না? এই দেখ পাশ্! হুঁ, হুঁ, আমার ছেলের চাকরির পাশ্—

ক্রমেই গলা চড়ছে তার, আর ঘাটাতে ভরসা পাই না। ফিরে এলাম। চারমণি মোটা যেন দৃষ্টির আগুনে আমার একশো পাউণ্ডের তনুদেহ ঝলসে ফেলতে চায়। এগোই ওকে ঘেঁসে। খনখনে ভুঁড়ি শেঠজী বললে, —কি ভাই, নামতে পারলে না? বুড়িয়াকে ঘাটিয়ো না, কি ধাক্কাটাই সামলে উঠেছে—

বাঙালী-মাসির ঝগড়ার দৃশ্যটা মনে পড়তেই হেসে গড়িয়ে পড়ল সবাই। আমারও হাসতে হাসতে পেটে খিল লাগবার জোগাড়।— বেচারি একা আমাদের সবার হয়ে দজ্জাল বিধবাদের সঙ্গে লড়াই করেছে এতক্ষণ, নইলে মজা টের পেতে, জীবনে ভুলতে না পারার মতন ভয়ঙ্কর মজা, হ্যাঁ,—আবার তারা হেসে গড়াগড়ি লাগায়,— বুড়িয়ার ধারে ঘেঁসতে যেওনা আর, জানলা দিয়ে গলিয়ে নাও—

সবাই তাই করছে, আর উপায় নেই। লাফিয়ে নিচে নামলাম। ঐযে ওপাশে খাবারের বাক্স নিয়ে ঘুরছে ফেরিওয়ালা। ক্ষুধাকাতর কণ্ঠের ডাক শুনতে পায় না সে। এগিয়ে গেলাম আমি। আর অমনি

গার্ডের "বাঁশী বাজিল কদম তলায়"। সর্বনাশ, ছুটে গাড়ির দিকে এগিয়ে এলাম। সত লাফিয়ে জানলা দিয়ে উঠতে যাই, পিছনে পড়ি। গাড়ি ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। হৈ-চৈ করে শেঠজীরা আমার ক্ষীণ অঙ্গ বাঘের মত থাবা দিয়ে ভিতরে টেনে তুলে নেয়। চারমণি মোটা স্থির দৃষ্টিতে দগ্ধে মারে আমাকে।

—আরে ভেইয়া, এতো দেরি করছিলে কেন ?—মোটাসোটা পাকাচুল হাসিখুশি শেঠজী চকচকে চোখে তাকিয়ে শুধায়।

—খিদে পেয়েছে যে ! খাইনি কতক্ষণ ;—অসহায়ভাবে আমি পেটে হাত বুলিয়ে চলি। এতক্ষণ শুধু উপর থেকে ওদের কথা শুনে ঘৃণামিশ্রিত ঔদাসীন্যে ওদের দিকে তাকাইনি একবারো—মুনাফালোভী ব্যবসায়ী ! এবার চেয়ে দেখি লোক তারা খারাপ নয়। বেশ মাইডিয়ার ভাব। হাসি হাসি সরলতা-মাখা মুখ। বিশাল দেহের তুলনায় মনটা অবিশ্বাস্য রকম সাদাসিধে মনে হয়। নেড়ার দল বিড়ির ভাণ্ডার নিঃশেষ করে না গেলে বিড়ি এগিয়ে ধরে বলতাম—পিয়ো। ওদের ভালবেসে ফেলেছি এবার—

ওঃ, ভুখা !—পাকাচুল শেঠজী সমজদারের মত মাথা দোলায়,—

—তা আগে বলতে হয় ! ছিঃ, ছিঃ, এতক্ষণ ভুখ নিয়ে বসে রয়েছো আর এতো খাবার আমাদের সঙ্গে !—সে আফশোষের ভঙ্গিতে মাথা দোলায়, হেঁড়ে-গলায় তার পাশের কম-বয়েসী শেঠজীকে খাবার বের করতে হুকুম দেয়।

—বসো ভেইয়া, ঘাবড়াও মৎ, আমরাও খাব এবার—

সে এক বিজয়া উৎসবের কারবার। কত লাড্ডু, পুরী, হালুয়া, তরকারি, সন্দেশ। এই খেয়ে খেয়েই তবে এদের এই ভুঁড়ি আর হাতের গোছা। নির্লজ্জ আমি চিরকাল, বয়লার ঠাসলাম তৃপ্তি মতন।

—পান ? সুগন্ধি পানের কৌটা সামনে মেলে ধরল পাকাচুল শেঠজী। বেজায় হাসি স্ফূর্তি করে খেল সবাই।

—কানপুর যাব আমরা, ব্যবসা! মাল কিনে ফিরবো ওখান থেকে।—পান চিবিয়ে শেঠজী বললে—রামজী জানে!

শুধু চাল ডাল ভুষিমাল নয়, আলাপ জমে উঠতেই বিস্তর কথা বলতে লাগল তারা। জহরলাল, কংগ্রেস, রাশিয়া, আমেরিকা – সব খবরই জানে দেখছি বাছারা। একবার আট-ঘাট বেঁধে শুরু করতে পারলে কথায় আমিও কম যাই না। দেখতে দেখতে লক্ষ্ণৌ এসে গেলাম কখন। অনেক আলো, অনেক চিৎকার। এবার নামতে হবে।

—রাম রাম।—সবাই অন্তরঙ্গতায় নকস্কার করলে। দরজায় বসা জটাই বুড়িকে একবার দেখে যেতে ইচ্ছে হল। বুড়ো শেঠজী মানা করলে,—ওর ধার মাড়িয়ো না। ছোকরা বয়স, জেনানাদের স্বরূপ জানো না! বুড়ি সাংঘাতিক চীজ! দেখলে না আগের ঝগড়া!

—বটে, বটে! বিস্তর নমস্কার বিনিময়ের পর ঝুপ করে শাখা-মৃগের মত জানলা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়লাম। যস্মিন দেশে যদাচার—কিন্তু চার মণ যদি হত আমার হাড় মাংসের ওজন? তবে কি অমনি লাফিয়ে পড়তে পারতাম? ভিতরে গিয়ে দেখোনা বেচারি একজনের মুখখানা একবার! ওহে ভাগ্যবিধাতা, আমাকে জন্মে জন্মে এই একশো পাউণ্ডের দেহবল্লরী খানাই প্রাণের সম্বল করে দিও। বিশেষ আগত প্রায় আণবিক যুগে—

ছয়

শুক্লপক্ষের খণ্ড চাঁদ দিগন্তে ডুবুডুবু তখন। তারা-ভরা আকাশের সুনীল অঙ্গন ঝকঝকে তকতকে, অনাবিল সুনির্মল। চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু কি কনকনে ঠাণ্ডা, ঠকঠকিয়ে কাঁপছি রীতিমত। খাওয়ার পালা চুকেছে, এবার শোবার পালা। কোথায় যাই এই রাতে। প্ল্যাটফর্মে রাতটা কাটিয়ে দেবো কোন রকমে। আলোয় আলোময় করে রেখেছে প্ল্যাটফর্ম, এখানে ওখানে আনাচে কানাচে লোকজন শুয়ে আছে চুপচাপ। বেশি চিন্তা না করে পাতলা কম্বল মাটিতে পেতে ওভারকোট চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ ভেঙে ছোটবেলার মত ঘুম নামল, যখন ইতিহাসের বই নিয়ে লণ্ঠনের সামনে বসতাম। আঃ— আর ঘুম ভাঙতেই মাথায় অসহ্য ব্যথা, শরীর ভারি, গলা আষাঢ়ের আকাশের মত জমজমাট। যখন লক্ষ্ণৌ শহরে এসে পৌঁছলাম তখন জ্বরে শরীর অবসন্ন। একটা আস্তানা চাই। দুদিনের বিশ্রাম, স্নান আর ঘুম।

অলস মন্থর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে তাকাচ্ছি চার পাশে। হঠাৎ সরু গলির মুখে সাইনবোর্ড দেখে থমকে দাঁড়ালাম। চমক লাগল। এখানে থাকলে কেমন হয়? পাণ্ডার আশ্রয় নিকেতন। নিরামিষ হোটেল। থার্ডক্লাশের যাত্রী, থার্ডক্লাশ হোটেলই ভাল। ঠিক হ্যায়, থার্ডং থার্ডেন যোজয়েৎ—

আশ্রয় নিকেতনের মালিক পাণ্ডাপ্রবরকে দেখে ভদ্রলোকের সন্তানের ঘাবড়ে যাবার কথা। কিন্তু এই প্রাণে অনেক সয়েছি, এটাও সয়ে গেলাম। লম্বায় ছফিট তো বটেই, আর বুকের ছাতি পঁচিশ থেকে আটাশ। নাক টিয়ে পাখীর, কান গাধার, ঠোঁট ধানশ পাখীর, গলা

হংস বলাকার, গাত্রবর্ণ বরাহের, আর কণ্ঠস্বর এমন একটি জন্তুর যেটা জন্মায়নি কিংবা বহুপূর্বেই ডাইনোরাসের মত পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। সাপের মত গোল নিষ্প্রত্র ছোট্ট দুটি চোখ তুলে পাণ্ডা তাকালে,—সিট্ চাই ? চারজনের ঘরে রুটি খেলে রোজ এক টাকা, দুই জনের ঘরে পাঁচ সিকে। ভাত খেলে যথাক্রমে পাঁচ সিকে আর দেড় টাকা।—বলেই বৃথা একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে বাজারের হিসাব লিখতে বসল প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটি।

·····হোটেলের দর শুনে আর এক কেচ্ছা মনে পড়ল। বিশ্বাস করো আর নাই করো,—আমাদের আজব সিলেটের কথা। বাজারবারে গ্রাম থেকে মেলা লোক আসত শহরে। রাতে হোটেলে থাকত। এমনি ব্যবস্থা ছিল সেখানে। এক ঘরে বিশ-ত্রিশজন লোক শোবে রাত্রে, যদি চিৎ হয়ে শোও—চাপ পয়সা। আর কাৎ হয়ে শুলে দুপয়সা। আর খাওয়া ? হ্যাঁ, মাছের মাথা চিবিয়ে খেলে দুআনা মাত্র, চুষে খেলে দুপয়সা,—সেক্ষেত্রে শোষিত মৎস্যমুণ্ডটি আবার ঝোলে ডুবিয়ে রেখে অন্যের পাতে দেওয়া যায়। বুঝলাম পাণ্ডাজীর আশ্রয় নিকেতনও সিলেটী হোটেলের রাজসংস্করণ মাত্র। সুতরাং এখানে থাকতে হচ্ছে, যেন তেন প্রকারেণ !

পাণ্ডাজীকে অভিপ্রায় জানালাম। দুইজনের ঘর, ভাত। মানে দেড় টাকা। পাণ্ডাজী খাতা থেকে চোখ তুলে একবার আমার আপাদ-মস্তক পর্যবেক্ষণ করে যেন টাকা পয়সার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে তার প্রাগৈতিহাসিক গলায় হাঁক ছাড়লে,—বাবুজীকে তিন নম্বর কামরায় নিয়ে যা—

দোতালায় তিন নম্বর কামরায় বাবুজীতো গেলেন, কিন্তু ভাতখাওয়া আর হলো না। জ্বর, সর্দি, কাশি রীতিমতো আসর জমজমাট। দুটো রুটি খেয়ে পড়ে রইলাম। ভালই হল, এতদিনে সুযোগ পেয়ে বই খুলে বসলাম। খানিক বাদেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

ঘুম ভাঙতেই অবাক। অনেক জানোয়ারের সংমিশ্রণে প্রস্তুত সেই পাণ্ডাজী দুই নম্বর বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। মাথার বাদামী চকচকে খুলির 'পরে ক-গাছি সরু পিঙ্গল চুল। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। কুৎসিৎ নাকটা প্রতি গর্জনের সময় উঠা নামা করছে—

ওরদিকে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টিতে, পাশ ফিরে হাতের উপর মাথা রেখে। কোন লোককে যদি অকারণ ঘৃণা করো তবে ঘুমন্ত অবস্থায় তার মুখে তাকিয়ে দেখো। দেখবে ঘৃণা মুছে গিয়ে স্বচ্ছ সহানুভূতিতে ভরে গেছে তোমার মন। কিন্তু ওর দিকে যতই তাকাচ্ছি ততই বিতৃষ্ণায় মন বিষিয়ে উঠছে। আপদটা এখানে এসে জুটলো কেন আবার ?

জানলা গলিয়ে বিকেলের মিঠে-কোমল রোদ তেরচা ভাবে ঘরের ভিতর লুটিয়ে পড়েছে। কী প্রচণ্ড গোলমাল আশে পাশে সর্বত্র। নিচের চাকর ঠাকুরের হৈ-হৈ শোনা যাচ্ছে। মন বিরূপ হয়ে উঠল। আজই এ নরককুণ্ড ছেড়ে চলে যাব। অত অভিজ্ঞতায় কাজ কি আমার।

নিতান্ত হঠাৎ বিনা নোটিশে পাণ্ডা চোখ খুলল, আর নিমেষে আমাদের শুভদৃষ্টি। অপ্রতিভ মুখে দুজনেই মুখ ফেরালাম। হাই তুলে সে উঠে বসল,—কেমন আছেন ? দুপুরে খেলেন নাতো কিছুই—

আহা, কি আদর ! রাগে গা জ্বলে গেল। সামলে বললাম,—আপনি কি রাত্রে এইখানেই ঘুমুবেন ?

—কেন বলুন তো ?—সে কুৎসিত মুখটা আমার দিকে এগিয়ে দেয়,—

—কিচ্ছু ঠিক নেই আমার। যেদিন যেখানে খালি সিট্ পাই শুয়ে পড়ি। তাছাড়া এ ঘরটা তো দুজনের—

পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। অসহ্য প্রেতটা গলায় কাশ তুলে বাইরে চলে গেল। আশ্রয়-নিকেতন ছেড়ে যাব কোথায় ? হু হু করে জ্বর

বাড়ছে, উঠবার সাধ্য নেই। ছটফট করে রাত কাটল, ভোর হল। জ্বর ছাড়েনি!

প্রেতটা মস্ত গ্লাস হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। বিছানায় উঠে বসলাম। সে জানলা খুলে সটান আমার বিছানায় এসে বসল! বাঁ-হাতে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে ডান হাতে গ্লাসটা আমার মুখে তুলে ধরল,—নাও, বার্লিটা খেয়ে ফেল।

আস্পর্ধা! মনে হল, একঝটকায় কাঁধ থেকে ঘিনঘিনে হাতটা ছুঁড়ে ফেলে লাথি মেরে আপদটাকে দূর করে দিই। মুখ শক্ত করে বসে রইলাম। সে কি বুঝল কে জানে, গ্লাসটা বিছানার এক কোণে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল,—বিদেশে এসেছো, বেঘোরে মারা পড়োনা। কি খাবে চাকরকে বলে দিও—

ব্যাটা লোভী বক-ধার্মিক! সে বাইরে যেতেই একটানে গ্লাসটা খালি করে ফেললাম। বেশ বানিয়েছে লেবুর রস দিয়ে। খানিক বাদে চাকরটা একটা কাপে করে সবুজ কিসের রস নিয়ে এসে হাজির,— পাণ্ডাজী পাঠিয়ে দিলেন : ওষুধ!

অ্যাঁ?—আমার বিস্ময় থৈ পায় না। চাকরটাকে বিত্তান্ত জিগ্যেস করি।

—হ্যাঁ, উনি কবিরাজও বটেন।—চাকরটা বিনীত হাসি হাসে,— আপনার গা ছুঁয়ে নাকি দেখেছেন দুই ডিগ্রি জ্বর, তাই পাঠিয়ে দিলেন ওষুধ—

বেশ ঝাঁঝ উঠছে ওষুধ থেকে। খেয়ে নিলাম এক ঢোকে। ব্যাটা বেশ দুপয়সা লুটে নেবে। বার্লি, ওষুধ, হ্যানো, তেনো। ওভার-কোটের গুপ্ত গহ্বরে হাত বুলিয়ে সঞ্চয়ের অস্তিত্ব অনুভব করলাম একবার।

আরো কয়েকবার এলো বার্লির গ্লাস আর ঝাঁঝ মেশানো ওষুধ। খেলাম। আর কিমাশ্চর্যম! বিকেলের দিকে যেন মাথাটা হঠাৎ

খুব পাতলা ঠেকল। জ্বরও যেন কম। মন খুশি হয়ে উঠল। শুয়ে পড়লাম।

কখন ঘুমিয়েছি জানিনা। হঠাৎ মৃদু শব্দে ঘুম ভেঙে তাকাতেই দেখি লণ্ঠন হাতে প্রেতটা ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিচ্ছে। বিতৃষ্ণায় চোখ বুজলাম। সে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে, কাছে, আরো কাছে। চোখ ফাঁক করে দেখি নিঃশব্দে অতি সাবধানে সে আমার দিকে এগোচ্ছে। ডাকাতি করবে নাকি? চেঁচাব? কিন্তু খালি হাতে ও আমাকে মারতে পারবে নাতো। ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকি। সে এগোয়, আমার শিয়রের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে লণ্ঠন তুলে তাকায়। আমি নিঃশব্দে পড়ে শ্বাস টানি। দেখি কি হয়। প্রেতটা লণ্ঠন নামিয়ে রেখে ডান হাতের তালু আমার কপালে রাখল এবার। ধীরে ধীরে তেমনি নীরব পায়ে আবার ফিরে গিয়ে তার বিছানায় শুয়ে পড়ল—

এই প্রথম ওকে অভিশাপ দেবার কথা ভুলে গেলাম।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম জ্বর ছেড়ে গেছে। কি আরাম। লাফাতে ইচ্ছে হল। কিন্তু ভাত না খেয়ে শরীর দুর্বল, তায় সর্দি-কাশি রয়েছে এখনো। উঠে বসলাম। প্রেতটা তেমনি বীভৎস-মুখে ঘুমুচ্ছে। একটা মাছি এসে উড়ে উড়ে বসছে ওর বিতৃষ্ণা জাগানো মুখে—

ও চোখ মেলতেই আবার আমাদের শুভ-দৃষ্টি হল। এবার আর অপ্রতিভ হলাম না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম,—জ্বর ছেড়ে গেছে, আজই চলে যাচ্ছি—

সত্যি?—সে কঠিন মুখে তাকিয়ে হাই তুলল।—বিদেশে এসেছো, ভাল করে শরীর না সারিয়ে পথে বেরিওনা—

তা বেরোব কেন! হতচ্ছাড়া মুনাফালোভী প্রেত! এখানে বসে বসে চৌকি ভাঙ্গি আর তুমি ভাড়া, ভাতের, ওষুধের, বার্লির দাম লুটে

নাও দুহাতে। মেজাজ খারাপ হয়ে যায় লোকটার মুখে তাকালে, আর মারতে ইচ্ছে হয় ওর কথা শুনলে। জুটেছে এসে আবার আমার ঘরে। কর্কশভাবে বলে উঠলাম,—সে তোমার চিন্তা নয়, ব্যবসা করতে বসেছো, টাকার সম্পর্ক। তোমার হিসাবটা ঠিক করে নাও—

—তাই নাকি? তবে টাকাটা না দিয়ে পালিও না!—মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে ঘিনঘিনে সুরে বলে উঠে সে,—তোমার মত অনেকে টাকা না দিয়ে পালায়—

মাথাটা ঘুরে গেল। রাগ সামলে নিলাম। সে বাইরে চলে গেল—

মনস্থির করে ফেলেছি। আজই চলে যাব। জ্বর নেই আর, যথেষ্ট বিশ্রাম হল। শুয়েছি বিস্তর। এবার পথের জন্যে মন আকুল হয়ে উঠেছে আবার। দুপুরে খেয়ে উঠে প্রেতটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম,

—দেখোতো আমার কত টাকা হলো—

—পাঁচ সিকে।—খাতা থেকে মুখ তুলে হেঁড়ে গলায় প্রেতটা বলে উঠল।

আকাশ থেকে পড়ি। পাঁচ সিকে? বলে কি?—তিন দিনের ঘর-ভাড়া, ওষুধ, পথ্য, খাওয়া,—কার হিসেব দিচ্ছ আমাকে,—আমি ওর পাশে বসে পড়ি স্তম্ভিত বিস্ময়ে।

—হ্যাঁ, তিন দিনের ভাড়া বার আনা, আর রুটির খরচ, আর তো কিছু না,—হিসেব লিখতে লিখতে তার কুৎসিত নাকটা ফুলে ফুলে উঠে, ভুরুহীন চোখ দুটো লোভের লাভের তাড়নায় যেন কাঁপতে থাকে,—দেখো, পয়সা না দিয়ে পালিয়োনা, হুঁসিয়ার!

আমি যেন বোকা বনে যাই। না হয় জ্বরের তাড়সে ভাত খেলাম না, কিন্তু বার্লি, ওষুধ?

—ওগুলোর দাম রাখলে না?—তার হিসেব-মগ্ন মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাই আমি।

—বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় তোমার মত ফকির নই আমি।—তেমনি টাকা-আনার হিসেব করতে করতে সে বিশ্রীভাবে বলে উঠে,—

—বিদেশে এসে অসুখে পড়লে দু গেলাস বার্লি দিয়ে পয়সা নেইনা আমি। আর ওষুধ? ডজন ডজন লোক বিনি পয়সায় প্রতিদিন আমার ওষুধ খাচ্ছে, ও আমি নিজে তৈরি করি—

অপমানে কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। সরোষে উঠে দাঁড়াই আমি,—আমিও তোমার ডজন ডজন ভিক্ষুকদের একজন নই। পয়সা দিয়ে খেতে এসেছি, পয়সা দিয়ে খাব।—

—পয়সা বেশি হয়ে থাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেল, আমি আমার হিসেবের বাইরে নেবনা এক পয়সা!—রাগে যেন জন্তুটি ফেটে পড়ে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে যেন মারতে আসে—

—ঝটপট পয়সা ফেলে ভাগো। তোমার সঙ্গে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করলে ব্যবসা চলবেনা আমার।

আমিও সগর্জনে পয়সা ছুঁড়ে ফেলে সদম্ভে দোতালায় উঠে গেলাম। আর নয়, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ব।—

আধ-বয়সী চাকরটা এগিয়ে এলো।—বাবুজি আজই চলে যাবেন এ অসুখ শরীর নিয়ে?

—আজই নয়, এক্ষুনি!—ঝংকার দিয়ে উঠি আমি,—পয়সা নেবেনা! ফকির নাকি আমি—

—ওই তার স্বভাব।—চাকরটি মধুর ভঙ্গিতে সবিনয়ে হাসে—হরদম হিসেব নিয়ে বাবুদের সঙ্গে ঝগড়া। দেখতে যাই হোক, মানুষ কিন্তু খুব ভাল। সংসারে একা। বিস্তর গরীব-দুঃখীকে বিনি পয়সায় খাওয়াচ্ছে প্রতিদিন। আর আমাদের যা সুবিধা দিচ্ছে—

—সে মরুকগে।—আমার থলি বাঁধতে বাঁধতে মাঝপথে থামিয়ে দিই ওকে,—আমি দুদিনের জন্যে এসেছি, পয়সার সম্পর্ক। ওষুধের দাম নেয়না কেন ও—

—ওষুধের দাম !—চাকরটা যেন একমুহূর্ত থমকে পড়ে। ছেঁড়া গেঞ্জীর কোণটা আঙুলে গোটাতে শুরু করে।—জানেন বাবু, সংসারে ওর একটি মাত্র ছেলে ছিল। বহু আগে সে ছেলেকে নিয়ে তীর্থে বেরিয়েছিল। জ্বর হয়ে মারা গেল ছেলেটি, কিন্তু পয়সা না থাকায় পাণ্ডাজী ওকে একফোঁটা ওষুধ দিতে পারল না একদিন। কসাই ডাক্তার-কবিরাজরা পয়সা ছাড়া তাকে দেখতেও রাজি হলনা বাবুজী। সেই ছেলেকে বেঘোরে হারিয়ে কেমন হয়ে গেল সে, কোথায় কোথায় ঘুরে কবিরাজী শিখল। এখন এ তল্লাটের লোক ওর ওষুধ খায়- সব বিনি পয়সায—

চাকরটি বখশিসের প্রত্যাশায় এসেছিল। তাই দিয়ে তাকে বিদায় করলাম। হাতে থলি ঝুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম। সে তেমনি হিসাব করছে, প্রতিটি পাই পয়সার হিসাব। নিঃসাড়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে সন্ধানী-চোখে তার জানোয়ারের মত ঘৃণা-জাগানো মুখে তাকালাম। কই, এবার তো আর ঘৃণা করছি না তাকে ? তক্তপোষের নিচে ঝোলানো তার দুপায়ে আমার সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির স্বীকৃতি স্বরূপ একটি লুন্ঠিত প্রণাম করতে সাধ জাগল। সাড়া পেয়ে সাপের মতন ভুরুহীন চোখ তুলল সে,—ভাব-লেশহীন, মায়া-মমতাহীন, কর্তব্যকঠোর দৃষ্টি। কিন্তু আমি নমস্কার করলাম তাকে,—চলে যাচ্ছি।

—ওঃ, তুমি তো পয়সা দিয়েছো ! ঠিক হ্যায়।—সে মাথা নেড়ে আমায় ইঙ্গিত করলে। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম ! হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় সে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল,—ওহো,—এই ওষুধটা নিয়ে যাও। দিনে তিনবার জলের সঙ্গে খাবে। বিদেশে জ্বর বড় সাংঘাতিক, বড় সাংঘাতিক।—বলতে বলতে তার গলা বুজে এল, তক্তপোষের উপর মেলানো খাতার উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে—

প্রায় ছুটতে ছুটতে আমি রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম—

সাত

আবার সেই পথ। সেই রেল ইস্টিশান, কোলাহল, নানান ভঙ্গির নানান দেশের সব মানুষ। কত বিচিত্র তাদের বেশভূষা, কত রঙীন তাদের আশা ভরসা, কত বিভিন্ন তাদের পথ চলার উদ্দেশ্য। এই কদিনেই যেন আমায় পথচলার দুর্নিবার নেশায় পেয়ে বসেছে, ঘরে মন টিকতে চায় না। কত আনন্দ উদ্বেলিত হৃদয়, কত ব্যথা জর্জরিত মন, কত বিচিত্র ভাবনায় রঙীন স্বপ্ন নিয়ে দলে দলে ভারতবাসী চলেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। গম্‌গম্‌ শব্দে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে ঢুকলো প্ল্যাটফর্মে। কিল্‌বিল্‌ করে লোক নামল, কতজন উঠলও। সবাইকে মনে হচ্ছে আপন ঃ ওই যে একদল গেঁয়ো মানুষ পাগড়ি মাথায় লাঠি হাতে বোঁচকা টেনে চলেছে, পিছনে সচকিত বনহরিণীর মত মেয়েরা, একজনের কোলে চঞ্চলমমতি এক বাঁদর। আর ওই দেখো, পা ভাঙা বীভৎসদেহ একটি ভিখিরি কচ্ছপের মত বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে সারা প্ল্যাটফর্ম। পিছনে তার ঘাগরাপরা লম্বা একটি মেয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে ভিক্ষে করছে। আহা, ওই যে একদলে গোটাকুড়ি মানুষ গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে অবাক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। পুরুষেরা মালপাত্র গোছাতে ব্যস্ত। মেয়েরা ডাগর চোখে তাকাচ্ছে আর ছেলেদের সামলাচ্ছে ব্যস্ত হাতে। ওরা দক্ষিণের লোক, দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে নিশ্চয়। ওদের দিকে মুগ্ধ কৌতূহলে তাকিয়ে সময় কেটে যায় আমাব। স্বপ্নের আবেশে মন ভরে উঠে। দক্ষিণের নারিকেল কুঞ্জ, সমুদ্র-সৈকত আর গোপুরণের নীলস্বপ্নে চোখে মায়া ঘনিয়ে আসে—ওগো দক্ষিণ, তোমায় দেখব কবে !

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ভারতের বিচিত্র জনসংঘের আনাগোনা দেখছি এক

কোণে দাঁড়িয়ে। একদল লোক মালপত্র নিয়ে এসে আমার পাশে গুছিয়ে বসল। সাতজন লোক দলে। পাঞ্জাবি মধ্যবিত্ত পরিবার। পাঞ্জাবের লোক প্রায় সবাই চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী। এখানে স্বাস্থ্য আর রূপ যেন পরম সখ্যে এক হয়ে মিশে গেছে। যেমন,—সুন্দর কথা আর সুরে মিলে সৃষ্টি হয় গান। প্রচুর মালপত্র নিয়ে সাতজন লোক প্ল্যাটফর্মের উপর রীতিমত এক সংসার সাজিয়ে বসে গেল। ব্যস্ত কথাবার্তা, ত্রস্ত হস্ত চালনা। বেচারিরা বোধ হয় ভুলে গেছে একটু পরেই এই মায়ার সংসার ছেড়ে ট্রেনে চাপতে হবে তাদের।
কিন্তু এতো রূপ! কর্তার দিকে তাকালাম। পঞ্চাশোর্ধেও রূপ যেন ফেটে পড়ছে। তেমনি আর সব কয়জন। বছর কুড়ির মেয়েটির দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। তবু এক ঝলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। প্রকাণ্ড সব বাক্স-প্যাঁটরা সামলে রেখে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান সুদর্শন ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। সামনে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি।
—একটু রশি হবে, মিস্টার?—দ্বিধাহীন সুরে বলে সে হাসি মুখে তাকাল।
আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি। থলি হাতড়ে রশির বাণ্ডিল বের করি। সুন্দল সুডৌল হাত বাড়ায় সে। বিছানার ছিঁড়ে যাওয়া অংশটি রশি দিয়ে বেঁধে টান হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ছোট ছেলের মত উজ্জল মুখে লাফ দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, রশির বাণ্ডিল ফিরিয়ে দিয়ে শুধোয়,—সিগারেট?
ধন্যবাদ জানাই।
—বেঙ্গলী?—তার নিখুঁত কামানো লালচে মুখে শিশুর সরল কৌতূহল ঝলমলিয়ে উঠে।
তাহলে চিনতে পেরেছে আমাকে। ভরসা ছিল না আমার। খুশি হই। ওর ওপর একটা স্নেহমাখা মমতায় মন ভরে উঠে মুহূর্তে। সেও

যেন মহাখুশি হয়ে যায় আচমকা,—আমি বাংলাদেশে যাইনি। কিন্তু সামনের মাসে কলকাতায় যাব আমি। জানো?—তার নীল ভাসা ভাসা চোখ দুটি আনন্দে চিক্‌চিক্‌ করতে থাকে। বাংলা ছবি দেখবো দু-তিনটি। আমাকে ভাল দেখে কটির নাম দাও তো। আর টেগোরের গীতি নাটিকা দেখতে পাবো? বলো কি, পাবো? বাই জোভ!—সীমাহীন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে সে। তারাও দিল্লী যাবে। লখ্‌নৌ এসেছিল এক আত্মীয়ের বিয়েতে। দেশ ঘুরবার খুব সখ তার, কিন্তু হয়ে উঠে না, আর দশজনেরি মত।

—রাজীন্দর?—ওর মা ডাক দিলেন ওকে। তিড়িং লাফ মেরে ছুটে গেল সে। একটু বাদেই দেখি আমার দিকে সকৌতূহলে তাকাচ্ছে সবাই। কি ব্যাপার!

আবার লাফ মেরে রাজীন্দর এসে হাজির। মুখে অপ্রতিভ হাসি,—মাইজী খেয়ে নিতে বলছেন একটু সবাইকে গাড়ি আসবার আগে, আপনিও—

—পাগল!—আমি আমার ক্ষুদ্র অক্ষিগোলক যতটুকু পারি বিস্ফারিত করি।—এখন খাব?

সে আমি কি জানি!—সে তেমনি মুখ জোড়া হাসি হাসে—মাইজীর সঙ্গে বোঝাপড়া করো। আমি বলেছি তুমি বেঙ্গলী, দূর দেশ থেকে বেড়াতে এসেছো—

ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন, আর এসেই আক্রমণ। বয়েস প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। কাঁচা সোনার রঙ। মাথার চুল প্রায় রূপোলী। নাতি-দীর্ঘ রোগাটে শরীর। চোখ মুখ থেকে গভীর মায়া মমতা ঝরে পড়ছে। দেখলেই মনে হয়,—মা, মাইজী, দি মাদার,—যে ভাষাতেই বলোনা কেন, আর কিছু নয়।—সাত-মুল্লুক দূর থেকে এসেছো দুর্বল শরীর নিয়ে, না খেয়ে মারা যাবে নাকি—

দুবলা শরীর! রোগা শরীরের জন্যে অনুগ্রহ দেখাতে গেলেই ক্ষেপে

যাই আমি। রাগ চেপে বলি,—মা, শরীর দুবলা নয়। জ্বর হয়ে হোটেলে পড়েছিলাম কয়দিন, আজ উঠেছি—

ভদ্রলোক এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলেন আমাদের। দুপা এগিয়ে এলেন এবার। হাতে-মাথায় স্পর্শ করে ভরসা দিলেন,—

—না, আর জ্বর নেই ; এখন খেলেই ঠিক হয়ে যাবে—

—না, না, খেলে মারা পড়ব আমি;—প্রতিবাদে ঝলসে উঠি। যত ভাবি সাবালক হয়ে উঠেছি ততই ঘরে-বাইরে সবাই আমার খাওয়া-পরা নিয়ে খবরদারির মাত্রা বাড়াচ্ছে। আমার দুর্বলতার খবর দেখছি অন্তর্যামীর মত জেনে নিয়েছে সবাই চতুর্দিকে—

—কি কথাই না বলছো বাছা,—মাইজী তেড়ে উঠলেন,—

—খেলে মারা যাবে ! আর না খেয়ে কয় বছর আগে যে তোমার পঞ্চাশ লাখ বেঙ্গলী মরে গিয়েছিল সে কথা ভুলে গেছো ? চুপটি করে এদের সঙ্গে বসে পড় এবার, গোল করোনা—

একজোড়া টিফিন-কেরিয়ার খুলে একে একে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন মহাত্মারা। লাড্ডু, পকৌড়ী, বেগুনী, পরোটা। কি কুক্ষণেই ছোকরাটা আমার কাছে রশি চেয়েছিল তাই ভাবছি। পুলিশী কায়দায় দয়াময়ী মাইজী একটার পর একটা পাতে দিচ্ছেন,—এটা না খেয়ে উঠলে, জানো তো—

অন্য দুটি ছেলের বয়েস বার ও দশ, ছোট মেয়েটির প্রায় আট। সবাই হাসি-ফুর্তি হৈ-হল্লা করে খেল। ওদের উচ্ছল স্বাস্থ্য, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ও প্রাণ-খোলা আনন্দোৎসবের মাঝখানে আমার দুবলা শরীর ও বহুরূপীর চেহারা নিয়ে রীতিমত বিব্রত বোধ করছিলাম। ওদের কোন হুঁস নেই। একজন ভিনজাতি অপরিচিত লোক যে ওদের পাশে বসে, এ যেন একেবারেই ভুলে গেছে তারা—

আমি রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছি। কোনমতেই ওদের সঙ্গে সহজ অন্তরঙ্গতায় মিশে যেতে পারছি না। ওই সাদাসিধে নিরভিমান

নওজোয়ান রাজীন্দর কোহলীর পাশে এসে না দাঁড়ালে এ সমস্যায় পড়তাম না। ভ্রাম্যমাণ বেঙ্গলী শুনলেই যে সে এমন আমায় লুফে নেবে কবে ভেবেছি বলো।

খাওয়ার পাট চুকতেই রাজীন্দর আমায় টেনে নিয়ে গেল টিকিট ঘরের দিকে। জ্বরে ভুগে উঠেই এমন গুরু ভোজন, আমি বাছুর খাওয়া অজগরের মতন নড়তেই পারছি না।

—একটা সিগারেট না খেলে আর পারছি না, তাই এদিকে এলাম,— সে তার মুখজোড়া মধুর হাসি হাসলে।

আর সিগারেট ধরাতে-না-ধরাতেই হুড়মুড়িয়ে ট্রেন এসে হাজির। তুমুল সোরগোল। ছুট লাগাই দুজনে। প্রচুর বাক্স-প্যাঁটরা দেখে মৌমাছির মত কুলির দল ঘুরঘুর করছিল। সবাইকে নিরাশ করে দিয়ে দৈত্যের মত একা একা রাজীন্দর সব তুলে ফেলল একটা থার্ডক্লাশ গাড়িতে। কয়মুহূর্তেই। আমি কিছুতে হাত ছোঁয়াবার সুযোগ পাই না। ভিড় নেই গোটেই গাড়িতে। ওপাশে দেশোয়ালী মেয়ে-পুরুষ বসেছে কজন। দুটি বাঙ্কে দুজন লোক শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে নির্ভয়ে। একটি বেঞ্চিতে দুজন সেপাইর মতন লোক। তাদের পাশে দোতারার মতন যন্ত্র হাতে উদাস-দৃষ্টি ঝোলা কুর্তা গায়ে এক বৈরাগী।

বৈরাগীর পাশে বসলাম আমি আর রাজীন্দর। বাকি ছয়জন একটা গোটা বেঞ্চি দখল করে বসল। সুন্দরী মেয়েটি নিশ্চুপ বসে জানলার পাশে। বাইরে মুখ ফেরানো, শুধু ওর রক্তিম গাল দেখা যাচ্ছে, আর রজত-শুভ্র ঘাড়ে এলিয়ে পড়া নেক্‌লেস। কোলের উপর অতি সুকুমার ভঙ্গিতে বাঁ-হাতে ধরা গরম কোট। তার পাশে ছোট মেয়েটি আর ছেলে দুটি হাসিতে গোলমালে গাড়ি সরগরম করে তুলেছে। এর পরেই কর্তা আর গিন্নি—

গাড়ির বাকি সবাই ফিরে ফিরে শুধু ওদের দেখছে। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর মূর্তিদের দেখছে সবাই প্রাণ ভরে। ওদেরই হুঁস নেই। মেয়েটি

তেমনি বাইরে তাকিয়ে, তেমনি স্থির, কোট কোলে নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বসে রয়েছে সে। ওর গলার স্বর শুনিনি এখন পর্যন্ত। খেতে বসে শুধু বাচ্চাদের সঙ্গে নীরবে হেসেছে—

গাড়ি ছাড়তেই বাচ্চারা জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কর্তা গিন্নি নিচু-গলায় কথাবার্তা শুরু করলেন। শুধু চেতনা নেই সুশ্রী তরুণী মেয়েটির। স্থির প্রতিমার মতই নিষ্কম্প সে বসে। রাজীন্দর নড়ে-চড়ে বসল একবার। এরপর শুরু হল কথার ফুলঝুরি। কচি ছেলেদের মত জোয়ান ছেলেটা কথায় কথায় স্বপ্ন দেখে চলে, চপল হাসিতে ভাঁজ হয়ে পড়ে যখন-তখন।

—সামনের মাসে আমার চাকরি হবে আসামে। এক মেডিক্যাল্ ইনস্ট্রুমেণ্টের দোকানে ডাক্তার-সাব চাকরি ঠিক করে দিয়েছেন আমার। কলকাতা হয়ে যাব আমি। টেগোরের গীতিনাটিকাটি শুনেছি অপূর্ব. —কি যেন নাম, শাপ, শাপ,—বরফের মত স্বচ্ছ-শুভ্র-হৃদয় ছেলেটা স্বপ্ন দেখেই চলে—

কিন্তু ওর কথা শুনে চমক লাগে আমার।—ডাক্তারসাব! ডাক্তারসাব কাকে বলছো?

—কেন, ওই যে,—সন্তর্পণে সে আলাপ-মগ্ন কর্তাকে দেখিয়ে দেয়। গলাবন্ধ গরম-কোট গায়ে, পরনে প্যাণ্ট। একমাথা রূপালী লম্বা চুল উল্টে আঁচড়ানো। কাচের অন্তরালে স্থির শান্ত দুটি গভীর চোখ! টকটকে গায়ের রঙ। চেহারার হাব-ভাবে গভীর এক আভিজাত্যের ছাপ ছড়ানো।

—কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম,—আমি থতমত খেয়ে চুপ করে যাই।

—হ্যাঁ, সবাই ভাবে। আর ঠিকই ভাবে। ওরা আমাদের আপন মা-বাবার মতই, কোন তফাৎ নেই। বরং আপনার চাইতেও বেশি বলতে পার। চলন্ত ট্রেনের গম্‌গম্ ঝম্‌ঝম্ ধ্বনির সুযোগে ফিসফিসিয়ে আমাদের কথা চলে।

—তাহলে ওরা ?—স্থির-মূর্তি অপরূপ দেহধারিণী মেয়েটির ও বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে আমি চাপা কণ্ঠে শুধাই।

—উঁহু ! কেউ ওদের নিজের ছেলেমেয়ে নয়,—রাজীন্দর গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ে। ওর হাসিখুশি উজ্জল মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া দেখে আমার ভাল লাগেনা মোটেই। বিব্রত চোখে তাকাই আমি। সব কেমন যেন গোলমেলে ঠেকে আমার কাছে।

—ওদের একটিই ছেলে ছিল। গত যুদ্ধের সময় মারা গেছে। অবিশ্যি যুদ্ধে নয়, এয়ার ফোর্সে-এ ছিল, এয়ার ক্র্যাশ্-এ ব্যাঙ্গালোরের কাছে মারা যায় সে।—রাজীন্দর ফিস্‌ফিসিয়ে যেন তদ্‌গত চিত্তে বলে যায়,—উনি ছিলেন মস্ত বড় মিলিটারী ডাক্তার, পেন্‌সন্ নিয়েছেন অনেকদিন—

তাহলে ওরা কারা ! ওই সুপুরুষ প্রাণখোলা দিলদরিয়া রাজীন্দর কোহলী, ওই অপরূপ মৌনমুখী মেয়ে, ওই চঞ্চল চমৎকার ছেলেমেয়েরা,—আমার ভাবনা থৈ পায়না। মাথা তেতে উঠেছে সমাধানহীন দুশ্চিন্তায়। আমি চুপ করে বসে রইলাম।

সামনে খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে রাজীন্দর। এমন দিল-দরিয়া উজ্জল মানুষটা যেন রাহুগ্রাসে চন্দ্রের মত হঠাৎ মুষড়ে পড়েছে। হাসিখুশি মানুষ হঠাৎ দুশ্চিন্তায় গম্ভীর হয়ে গেলে তার আপনজনেরা যেমন ঘাবড়ে যায় আমারও সেই দশা।

অনেক পরে ঘাড় ফিরিয়ে মুখ খুলল সে। থমথমে সুরে বললে,—তোমরা বেঙ্গলীরা আমাদেরি মত নিজের রক্ত ঝরিয়ে স্বাধীনতা এনেছো। তুমি বুঝবে আমার দুঃখের কথা। আর তোমাকে বলেও আমার শান্তি,—খুব কম লোককেই আমি এ সব বলেছি। তোমাকে ভাল লেগেছে আমার—

পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলায় সুখে ছিলাম আমরা, কোহলীরা। বেশ কিছু জমি ছিল দেশে। বাড়িতে বসে তাই দেখাশোনা করতেন

বাবা। বড়ছেলে আমি কলেজে উঠে পড়তে এলাম লাহোর। উদ্দেশ্য পড়বার যতটুকু ছিল তার চেয়েও বেশি ছিল ক্রিকেট খেলার। ক্রিকেট! স্কুল থেকেই ক্রিকেট ক্রিকেট করে পাগল হয়েছিলাম। আর কোন স্বপ্ন ছিল না, ধ্যান ছিল না। দুনিয়ার তাবৎ খেলোয়াড়দের নাম ধাম আর খুঁটিনাটি আমার মুখে মুখে ফিরতো। দিন রাত ওতেই ডুবেছিলাম। স্বপ্ন দেখতাম, একদিন আমার নামও আমনি কত খ্যাপা ছেলের মুখে ফিরবে। দেশে কী হচ্ছে না হচ্ছে কোন খবরে কান দিতাম না আমি। শুধু ক্রিকেট! সেবার ছুটিতে দেশে গেলাম আমি? ভাল লাগল না। মন কেবল উড়ে উড়ে গিয়ে বসে লাহোরের কলেজের মাঠে, যেখানে নামজাদা কোচ্ এখন ছেলেদের ক্রিকেট শিখাচ্ছে। শেষ পযন্ত আর সামলাতে পারলাম না। ছুটি শেষ হবার আগেই সবাইকে রাগিয়ে বাড়ি ছেড়ে এলাম। ক্রিকেট খেলতে হবে! নিরুপায় দুঃখে মা কাঁদলেন, বাবা কথা কইলেন না, আমি দেখেও দেখলাম না কিছু। চলে এলাম লাহোর—

চারদিকে তখন কত নারকীয় কাণ্ড ঘটে চলেছে দেশ জুড়ে। আমি জানতে চাইলাম না কিছু। প্রাকৃতিক আর রাজনৈতিক আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে শুধু ক্রিকেট নিয়ে মেতে রইলাম। শেষ পর্যন্ত মাথায় যখন বাজ এসে পড়ল, তখন মালুম হল। স্বাধীনতার দাম দিয়েছে বাঙালি আর পাঞ্জাবি। দেশ টুকরো করে, ভিখিরি হয়ে, আপনজন হারিয়ে, নিজের বুকের রক্ত ঝরিয়ে। খেলতে খেলতেই একদিন আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল। কেন, জানি না। তখন আমি সব জেনেছি, সব বুঝেছি—এতদিন ক্রিকেটের মায়াজালে আটকা পড়ে যা দেখিনি সব দেখলাম। প্রায় পাগল হয়ে গেলাম আরো অনেক বন্দী ছেলের মত। কতদিন পরে ছাড়া পেলাম হিসেব নেই। দেশ তখন শ্মশান। জীবন বিপন্ন করে ছুটে গেলাম দেশে। জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে আমার ঘর বাড়ি সব কিছু। অনেক মরেছে,

বাকি যারা বেঁচেছে সব পালিয়েছে হিন্দুস্থান। লায়ালপুরে একজনও হিন্দু নেই আর—

আমাদের পোড়াবাড়ির ধ্বংসস্তূপের ভিতর দাঁড়িয়ে আমি তখন চুল ছিঁড়ছি। আমার মা বাবা? তারা কোথায়, কোথায়? হা ভগবান! পাগলের মত তাদের কোন স্মৃতির সন্ধানে সেই ধ্বংস স্তূপ ঘাঁটিতে থাকি আমি। হঠাৎ আধপোড়া রাশি রাশি বইয়ের গাদা থেকে উঁকি মারে ক্রিকেট ব্যাট।

এই ক্রিকেটে-এর জন্যেই আমি কাঁদিয়ে গেছি আমার মা বাবাকে, হারিয়েছি তাদের। পাগলের মত সেই পোড়া ব্যাট-এ লাথি মারতে মারতে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম আমি—

তারপর আধমরা হয়ে এলাম হিন্দুস্থানে। কত কাণ্ড, কত রক্তের ঝলকানি দেখলাম সারা পথে। পাঞ্জাবের পথে পথে সেদিন নিরাবরণ মেয়েদের চাবুকদিয়ে ভেড়ার পালের মত তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ডাকাতের দল। গোটা ট্রেন শুদ্ধ ছেলে-মেয়ে-বুড়োকে কেটে কুচিকুচি করেছে। আগুনের লাল শিখা ভগবানের দরবার ছুঁয়েছে। আমাদের ট্রেন আক্রমণ করেছিল পাগল জনতা। প্রাণে বাঁচলাম, তলোয়ারের খোঁচায় আঙুল একটা উড়ে গেল আমার। সে থাক তোমরাও দেখেছো এসব, নয়তো কাগজে পড়েছো। ভিখিরি হয়ে এলাম হিন্দুস্থান। কোথায় আমার বাড়িজমি, মা বাবা, কলেজ আর—আর ক্রিকেট! এরপর পাগলের মত খুঁজে বেড়িয়েছি তামাম উত্তরভারত, পশ্চিমভারত। জম্মু থেকে বোম্বাই, জয়পুর থেকে গোরক্ষপুর! আমার মা বাবাকে পাইনি। আজো খুজি আমি, এই দেখোনো জানলা দিয়ে সব সময় বাইরে তাকিয়ে খুঁজি আমি। এমনি খুঁজছে আরো কত হাজার জন—

সজীব সুরভিত গোলাপকে আগুনের উত্তাপে ধীরে ধীরে শুকনো খটখটে হয়ে যেতে দেখেছো? এই আমি দেখলাম: রাজীন্দরের

তারুণ্যের আর অকারণ খুশির আলোয় ঝলমল মুখ বেদনায় রেখায়িত হয়ে উঠল। সে মুখে মানুষের নীচতার জঘন্যতার জন্যে ঘৃণা আর নিবিড় মর্মবেদনার কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো। এরকম মুহূর্তে চুপ করে থাকতে হয়, থেকেছিও আমি তাই চুপ করে। জানি, তার ভিতরের বয়ে বেড়ানো দুঃখের বোঝা কমাতে সে আপনিই কথা বলবে—

—দুশমনের তলোয়ারের আঘাতে আমার আঙুল কাটা পড়েছিল। আমার তখন এসব চিন্তা করবার খেয়াল ছিলনা। দিল্লীর এক ক্যাম্পে এসে শেষ পর্যন্ত আঙুল নিয়ে আধমরা হয়ে পৌঁছুলাম আমি। ডাক্তারসাব তখন প্রাণ ঢেলে সব ভুলে আমাদের সেবা করছিলেন ক্যাম্পে ক্যাম্পে। আমার আঙুলের অবস্থা দেখে শিউরে উঠলেন তিনি। বললেন, তাড়াতাড়ি না সারলে আমার গোটা হাত কেটে ফেলতে হবে। রিফিউজী ক্যাম্পের অবস্থা দেখেছো তো তোমরা বেঙ্গলীরা। আমাকে বাঁচাবার জন্যে তাব বাড়ি নিয়ে এলেন আমাকে।

রাতের পর রাত আঙুলে সেফ্‌টিক্ নিয়ে প্রবল জ্বরে প্রলাপ বকেছি, মাইজী শিয়রে বসে রাত কাটিয়েছেন। ভাল হয়ে উঠলাম। চলে আসতে চাইলাম, ছাড়া পেলাম না। নিজের ছেলেতো গেছে তাদের, কিন্তু নতুন পাওয়া ছেলেমেয়েদের আর ছেড়ে দেবেন না তারা।

সেই থেকেই আছি ওদের কাছে। কোন দুঃখ নেই! শুধু খেলার মাঠের ধার মাড়াইনা ভুলেও। খবরের কাগজে খেলার পাতা উল্টে পড়ি, খেলার আলাপ শুনলে কানে আঙ্গুল দিই। আর এখনো পথে পথে খুঁজি, শুধু সন্ধানী চোখে তাকিয়ে দেখি যদি আমার আপন মা বাবা—

রাজীন্দর থামল। তারপর হঠাৎ ছেলে মানুষের মতন অর্থহীন হাসি হেসে উঠল। সোজা হয়ে বসল,—একটা সিগারেট খেতে হচ্ছে এবার, কি বলো?—সজোরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে যেন সে যতো দুশ্চিন্তা

দুঃস্বপ্নের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু আমি এর শেষ শুনতে চাই—

—তাহলে ওরাও কি এভাবে এসেছে?—আমি মাথা দিয়ে ওদের দিকে দেখাই। বাচ্চারা ফিরে এসে বসেছে বেঞ্চিতে, কি একটা খেলনা বের করে তুমুল কোলাহলে খেলায় মন দিয়েছে। আর তখনো তেমনি আনড় কেটে কোলে বসে রয়েছে রূপসী মেয়ে—

—নিশ্চয়!—আমার চোখে তাকিয়ে সজোরে মাথা নাড়ে জোয়ান সুদর্শন ছেলে।—আরো অনেক ছিল, তাদের কারো বিয়ে হয়েছে, কেউ চাকরি করছে অন্য কোথাও, যেমন আমি করবো। কিন্তু সবাই আমরা ভাইবোন, এই আমাদের সবার মা-বাবা,—রাজীন্দর হাসে,—এইতো আমাদের এমনি একভাই এখন লখনৌ-এ ভাল ব্যবসা করছে, তার ছোটবোনের বিয়ে দিল সে। সেই বিয়েতে এসেছিলাম আমরা—

এরা সব এসেছিল পাকিস্তান পাঞ্জাব থেকে,—মা বাবা আত্মীয় বন্ধু বিহীন সর্বস্বহারা ছেলে মেয়ে, নতুন মা বাবা পেয়ে আবার জেগে উঠেছে তারা। আবার উৎপাটিত নবাঙ্কুরের ডালে ডালে প্রেম ভালবাসার ফুল ধরেছে স্তবকে স্তবকে, জীবনের জয়গান উঠেছে ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় হাসির আনন্দের ফোয়ারা উঠেছে রুদ্ধমুখ প্রস্রবণের বুক ফুঁড়ে—

ডাক্তারসাব এখন চোখ বুজে বেঞ্চিতে বসেছেন। স্থির, সোজা, ধ্যানমগ্ন-মূর্তি। বিবেকানন্দ বলেন নি, সম্মুখে ঈশ্বর ছাড়ি কোথা তুমি খুঁজিছ ঈশ্বর—? ডাক্তারসাবের সুগৌরসৌম্য ধ্যানমগ্ন মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে হল উনি যেন দীপ্ত এক প্রদীপ শিখা, যার আগুন থেকে অনেক অকালে নিভে যাওয়া প্রাণ প্রদীপে নতুন জীবনের শিখা জ্বলে উঠেছে, আরো জ্বলবে—

এতো প্রাণে ভালবাসায় ভরপুর অগ্নিশিখা থাকতে তবে কেন আমি

আগত রাত্রির ভ্রূকুটি কুটিল তমিস্রার ভয়ে থরো থরো ? এতো আলো থাকতে মানব মনের অন্ধকার রাক্ষুসী কী করতে পারে পৃথিবীর ! নাই নাই, কোন ভয় নাই, আলোর হবে জয়—

কিন্তু ও কেন ঘাড় ফিরিয়ে বসে আছে বাইরে চেয়ে, ওই জানলার পাশে নীরব নিথর অপরূপ কুমারী মূর্তি ? সেও বুঝি কাউকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে—

—আর ওর ব্যাপার কি ? ও এমন নিথর কেন ?—আমি রাজীন্দরকে না শুধিয়ে পারিনা। এখন ওর সুগঠিত লালচে হাত আমার হাতে, তার তাজা যৌবনের উত্তাপে আমার রুদ্ধ যৌবনের রক্ত সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে—

—ওর কথা শুনতে চেয়োনা,—অতি ধীরে, প্রায় কানে কানে ফিসফিস করে বলে উঠে বন্ধু, ওর গরম নিশ্বাস আমার গালে এসে পড়ে;—শুনতে চেয়োনা। শুধু জেনে রাখো, ওর বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের কারো শান্তি নেই। স্বাধীনতার দাঙ্গার সময় কত হাজার হিন্দু-শিখ-মুসলমান মেয়ের কুৎসিত পরিণতি ঘটল, সেতো জানো তুমি ! কত মেয়ের কোন উদ্দেশ নেই আজো, শুধু তাদের উদ্ধার করবার জল্পনা কল্পনাই চলছে। তেমনি একটা কিছু,—কিন্তু, ওঃ,—

—প্লিজ, প্লিজ, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, ডোন্‌ট্‌ আসক্‌ মি এ্যাবাউট্‌ হার। প্লিজ,—

তার সুন্দর হাতে আমার কর্কশ ঠাণ্ডা হাত জড়িয়ে ধরেছে সে গভীর আত্মীয়তায়। জানিনা, কেন তোমাকে এত কথা বললাম। ট্রেনে মানুষ মানুষকে বড় কাছে টেনে নেয়, এক মুহূর্তের ব্যাপার তো ! এই জন্যে আমি ট্রেনে চড়ি খুব। দেখি, যার সঙ্গে বাইরের দুনিয়ায় তোমার নিত্য হানাহানি, গাড়ির ভিড়ে সে তোমায় খাওয়াচ্ছে, তোমাকে মনের কথা খুলে বলছে। তারপর গাড়ি থেকে নেমেই সব

ভুলে যাচ্ছে। এখানে মানুষ খাঁটি মানুষ, ভাই ভাই,—সাথী। তাছাড়া তোমাকে দেখেই ভাল লাগল হঠাৎ, এতো কথা বলে ফেললাম। কিন্তু ওর কথা শুধায়োনা, বন্ধু। সে সইতে পারা বড় কঠিন। সে পারে মাইজী, তুমি আমি নয়! ওই শিবের মত মানুষ ডাক্তার সাবও নয়। জানো? ডাক্তার সাবের চুল সব এতো রূপোর মতো ছিলনা আগে। ওর কথা শুনে, ওর চিন্তায় রাতারাতি তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন—

—বেশ! তবে সর্বংসহা মা বসুমতীর জাত সে বীভৎস দুঃখের জ্বালা সইতে থাকুন, যেমন তাঁরা সয়েছেন যুগে যুগে, দেশে দেশে। সীতার মতন, প্রতি মায়ের মতন—

আট

কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার বালখিল্যদের খিদে চড় বড়িয়ে উঠে। আবার মাইজী বিকটাকার টিফিং কেরিয়ার খুললেন। আমার পাকস্থলী ত্রাসে লাফিয়ে উঠে আবার। আবার সেই ভুরি ভোজন। না বলবার উপায় নেই। রাজীন্দরের দল কি সাধে অমন চেকনাই ছাড়ছে, এরকম খেলে আমিও হয়তো একদিন "হোঁদল-কুঁৎকুৎ" হয়ে যেতে পারি। খেতে খেতে মাইজী খুঁটিয়ে যত প্রশ্ন করেন আমাকে। মেয়েলি সব কৌতূহল। সব ঘরের খবর। আর তারি ফাঁকে ফাঁকে দুবলা শরীরের জন্যে সবোম উপদেশ।

—না খেয়েই বিশ্বজয় করতে চাও তোমরা বোকা ছেলে।— কৃত্রিম রাগে ঝ কার দিয়ে আমার প্লেটে একরাশ খাবার ঢেলে দেন তিনি। ঘাবড়ে যেওনা অসুখ হলে সব দায়িত্ব আমার। এতগুলো ছেলেমেয়ে মানুষ করছি আমি, ভয় পেয়োনা আমাকে।

ভয় পাব? এরকম অবিশ্বাস্য পিতৃমাতৃ স্নেহের কল্যাণধারা যদি অন্তত ডজন খানেক লোকের বুকেও উদ্বেলিত হয়ে উঠতো তাহলে কত লক্ষ মরা প্রাণ আবার জীবনের আনন্দোল্লাসে গান গেয়ে উঠতো। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে স্মিতধার ভালবাসার ও স্নেহময়ী সুভাষিনী মাইজীর মুখে ফিরে ফিরে তাকাতে থাকি—

আর যতো দেখি, যতো রাজীন্দরের কথাগুলো মনে পড়ে ততই মনে বিপুল ভরসা. জাগে : সবার বেঁচে থাকবার ভরসা, সবার গান গাইবার অধিকারের ভরসা, পৃথিবীকে স্বর্গ করবার ভরসা utopia-র ভরসা— মুখের জিবটার মত আমার মনের জিবটাও সদাই মিষ্টি চাখবার জন্যে উন্মুখ। আর আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে অমৃতের আস্বাদ পেয়ে

মনের জিব আত্মহারা হয়ে গেল তৃপ্তির আনন্দে ঃ মানব হৃদয়ের অমৃত, যার নাম ভালবাসা—

খেয়েই বালখিল্যেরা ঘুমে ঢলে পড়ল। ছেলে দুটোকে বাঙ্কে তুলে দিয়ে ছোট মেয়েটিকে বেঞ্চে শুইয়ে কম্বল চাপা দিলেন মাইজী। বাক্যহীনা তরুণী তার গরম কোটে মাথা ঢেকে বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়ে বসল। হাঁটুর উপর কম্বল বিছিয়ে দিয়ে তেমনি চোখ বুজে বসে রইলেন স্মিতবাক ধ্যান-গম্ভীর ডাক্তার সাব।

আমার এক কাঁধে বৈরাগী মাথা ফেলেছে, অন্য কাঁধে রাজীন্দর। পথের সাথী, ওরা ঘুমোক। ওই রহস্যময়ী কোটে মুখ-ঢাকা মেয়েটির মত আমিও নিথর পাথরে মূর্তির মত বসে ওদের ঘুমোতে দিলাম। বসে বসে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে আমার তন্দ্রা আসেনা, এই নিরালা মুহূর্তে চিন্তা করতে ভালবাসি আমি—

প্রায় দুশ' মাইল ছুটে এসে মোরাদাবাদে থেমে হাঁপাতে লাগল ট্রেন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ঝোলা কোর্তা গায়ে বৈরাগী, দোতারা হাতে নিয়ে তার ঝুলি পিঠে ফেলে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ আমার নাকের সামনে তার শিরাজাগা শীর্ণ হাতখানি মেলে ধরল,— রাধে কৃষ্ণ!

এদেশী বৈরাগীও রাধে কৃষ্ণ বলে নাকি! হিন্দিতে শুধাই,—কোন দেশী লোক তুমি?—কাঁচা পাকা দাঁড়ির ফাঁকে হাসল বৈরাগী। চোখ থেকে ঘুমের আবেশ ছুটে যায়নি তখনো, খাঁটি বাংলায় বললে,—

—তোমাদের ওসব কথা বুঝিনা বাবা, বাংলা দেশ জানো? সেই দেশ থেকে আসছি তীর্থে ঘুরতে, খিদে পেলে ভিক্ষে করি—

—বটে! তা এতক্ষণ আমায় কষ্ট দিলে কেন?—পরম আত্মীয়তায় হেসে ক্ষুব্ধ অভিমানে শুধাই আমি,—বাংলায়।

—কষ্ট দিলাম!—তার সুরে স্পষ্ট ত্রাসের আভাস। ঘোলাটে চোখে ঝিলমিল ছায়া।

—দিলে বৈকি! এতক্ষণ ভিনদেশী ভাষায় কথা বলে বলে মুখ ব্যথা পেল। তোমার সঙ্গে একটু বাংলা বলতে পারলে বেঁচে যেতাম। ঠিক আছে, এই ইস্টিশানে যেতে পারবেনা তুমি,—অপরাধের খেসারত দাও—

বলেন কি বাবা!—বাবাজী ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠে। দোতারা দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠে উত্তেজনায়,—কাল আমার গুরুদেব আসবেন এখানে, এঁ্যা?

রাজীন্দরকে বলতেই লাফিয়ে উঠে সে,—বলো কি! বেঙ্গলের Folk Song! শুনতেই হবে! ঘাবড়াও মৎ, ট্রেন দাঁড়াবে কুড়ি মিনিট—

অনেক বুঝিয়ে বাবাজীকে রাজি করানো গেল। দোতারার সহজ সুর-ঝংকারে গাড়ির ভিতরে সবাই চোখ মেলে তাকালে। সহজ সুরেলা গলায় গান ধরলে বৈরাগী—মিষ্টি স্বপ্নের ছায়া নামল যেন উপর থেকে, ধীরে, অতি ধীরে—

—ও মন গুরু ভজরে, ওরে সোনার চান্দ,
দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, সে দিবে আসান! ও মন—

গানের অর্থ বুঝিয়ে দিতেই লাফিয়ে উঠে রাজীন্দর। স্মিতমুখ ডাক্তার সাবকে সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দেয় অসীম উৎসাহে। হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠে,—ওঃ, ওয়াণ্ডার ফুল! আরেকটা—

অনেক অনুরোধে বাবাজীর চিঁড়ে ভিজল। আবার গাইতে লাগল সে তেমনি চোখ বুঁজে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দাঁড়ি গোঁফের আড়ালে ঠোঁট নেড়ে—

—বানাইয়া রংমহল ঘর, কোন কোঠায় লুকাইল
মন তোর ঘরের কারিগর।
হাড়ের খুঁটি চামড়ার ছানি, জোঁত গাঁথুনি কি সুন্দর।

আট কুঠরী নয় দরজা হয়,
আঠারো মোকামের মানুষ আঠারো জন হয় ॥
রবি শশী দুইটি বাতি
জ্বলতে থাকে নিরন্তর ॥
কোন কোঠায় লুকাইল মন
তোর ঘরের কারিগর ॥

আফশোষ হল। বাবাজীকে বাদ্য সমেত দেখেও কেন এতক্ষণ নজর দিইনি। আহা, সহজ মানুষের সহজ সুরের সহজ গানে যেন রোদের মিষ্টি আলো ঝিলমিলিয়ে উঠল আমাদের মনে! লম্বা আধ-পাকা দাড়ি, জট বাঁধা চুল, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, যন্ত্র বাজিয়ে গভীর দরদে গাইছে বাবাজী—

—দরিয়ায় ভাসিলাম রে সাধু ভাই ॥
আইন্যা দিলে খাইবার আছেন
সঙ্গে যাওয়ার কেউ নাই ॥
স্ত্রী হইল পায়ের বেড়ী, পুত্র হইল কাল,
তিন বেতালে মিলিয়া আমার বাড়াইল জঞ্জাল ॥—

ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হল। গার্ড বাঁশী বাজাল। ব্যস্ত হয়ে পড়ল বাবাজী।—রাতে খাব, দ্যান কিছু—
কিছু নয়, অনেক পেল সে। কিন্তু দিয়ে যে গেল তার চেয়ে অনেক বেশি, এমন কিছু, যার দাম সিকি আধুলি দিয়ে যাচাই হয়না—
যতক্ষণ পারি জানলা গলিয়ে তার অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে তৃষাতুর চোখে তাকিয়ে থাকি। দারুণ বিরহ বেদনায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠে,—কেন, কেন, কেন এতক্ষণ অন্ধ ছিলাম। কেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর পাশে বসেও তার রত্নের খোঁজ নিলাম না। মূর্খ আমি, পণ্ডিত মূর্খ—

গভীর অনুতাপের দীর্ঘ-নিশ্বাসে জানলা থেকে চোখ ফেরাতেই

নীরব নিস্পন্দ অনিন্দ্য রূপসীর সঙ্গে চোখাচোখি। চকিতে কোটে মুখ ঢাকল সে। ফিরে এসে বেঞ্চে বসতেই উজ্জ্বল মুখে আমার হাত জড়িয়ে ধরে রাজীন্দর,—তোমরা সত্যি ভাগ্যবান !—

কেন ?

কেউ জবাব দেয় না। কিন্তু ডাক্তারসাবের ও মাইজীর চোখে মুখে মুগ্ধ পুলকের আলোয় আমার প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাই—

আর অমনি অনুতাপে আত্মধিক্কারে প্রিয় বিচ্ছেদ বেদনায় গভীর ভালবাসায় আমার অন্তরাত্মা উথলে উঠল। একবার দেখা দিয়ে যে চিরতরে লুকালো সেই বিবাগী। পথের গায়কের বিরহে সে আমার নিখিল বিশ্ব নিমেষে অন্ধকার হয়ে গেল। এমন তীব্র অনুভূতি আর কখনো কারো জন্যে আমার হয়নি। হলেও এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। বহুদিন কাঁদিনি. এই মুহূর্তে সারা বুক ভেঙে বাঁধ-ভাঙা কান্নার ঢেউ উথলে উঠল. আমার চোখ জ্বালা করে উঠল আচমকা—

বহুবারের মত আবার বুঝলাম চোখের জলের মত অমূল্য পৃথিবীর আর কিছু নয়। জানলার পাশে বসা মেয়েটির মত আমিও কোটে মুখ ঢাকলাম—

হায় চির অচেনা বৈরাগী ! 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারি ঘায়ে—'

অনেক পরে চোখ মেলে দেখি গাড়ি কোন ফাঁকে বোঝাই হয়ে গেছে আবার। দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। একদল বেদে উঠেছে। লম্বা জোয়ান চেহারার পুরুষগুলো কর্কশ গলায় আলাপ করছে, আর মাটিতে লোটানো ঘাগরা পরনে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েগুলো বাচ্চাদের দুধ দিচ্ছে নিঃসংকোচে। খাবারের চাঙারি খুলল তারা। উগ্র হিঙের গন্ধে ছেয়ে গেল চারদিক। গাড়ির মেঝেয় গোল হয়ে বসে চড়া গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে কেউবা খাচ্ছে, কেউ জামার উকুন বেছে চলেছে।

হঠাৎ দেখি এক মূর্তি, চাপ বাঁধা ভিড়ে অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে দুলছে। লম্বা, আমার চেয়েও রোগা, খড়্গ-নাসার উপর বসানো পুরু কাচের চশমা, তার পিছনে জ্বলজ্বলে বিদ্রোহী একজোড়া চোখ। বেশ পুরু একজোড়া গোঁফ তার পৌরুষ ঘোষণা করছে সদম্ভে, নয়তো শরীরে গর্ব করবার মত কিছুই নেই। একে দেখেই আকৃষ্ট হবার কথা, অন্তত আমার পক্ষে। তাই উন্নত কপালের তলায় কাচের অন্তরালে ওর বিদ্রোহী চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছু পরেই চোখা-চোখি হল, চোখের ইসারায় হেসে কাছে ডাকলাম।

এল। চব্বিশের বেশি কখনো হবেনা। একমাথা রুখু ঝাঁকড়া চুল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সরু পাতলা হাত নিচে নেমে বিকশিত হয়েছে শিল্পী সুলভ চম্পকাঙ্গুলিতে। এতো সুন্দর আঙুল কোন পুরুষের হাতে দেখিনি কোনদিন। শিল্পী হবে সে নিশ্চয়ই, কোন ভুল নেই। বৈরাগীর ছেড়ে যাওয়া জাগয়ায় ওকে বসতে আহ্বান জানিয়ে সরে বসলাম একটু। তার ভুল নেই, সটান শুধিয়ে বসলাম,—বঙ্গভাষী নিশ্চয় ?

স্মিতমুখে হাসলে সে। পুরু গোঁফের তলায় রমনীয় ভঙ্গিতে পাতলা ঠোঁট দুটি দীর্ঘায়িত হল কয়েক মুহূর্ত। এতো ছোট্ট মিষ্টি হাসিও খুব কম দেখেছি। চমক লাগল।

আমার ও রাজীন্দরের মাঝখানে বসে অনর্গল কথা বলতে থাকে সে। পশ্চিম দিগন্তের ম্লান-অস্তরাগের মত তার ঠোঁটে ভেসে থাকে অতি মিষ্টি হাসির ছায়া।

—আপনিও দেখছি আমারি মত।—শান্তি দত্ত তার জ্বলজ্বলে চোখ রাখলে আমার চোখে,—পাগল, পাগল ! কি ভাবে টুপাইস্ আসবে তা না ভেবে আছেন পাগলামি নিয়ে। অন্তত আমার স্বপ্ন সাধনার এই ব্যাখ্যাই আমার গুরুজনদের মুখে শুনে আসছি আমি চিরদিন,— পাগলামি ! আমি সেতার বাজাই, সেতারের জগতে অনেক

উঁচুতে ওঠবার স্বপ্ন দেখি। আর দুটো বছর আমি রোজগার না করলে আমার সংসার উচ্ছন্নে যেতোনা, কিন্তু আমার সাধনা সম্পূর্ণ হতো। আপনি বুঝবেন।—বুকের ভিতর তখন দিনরাত ঝড় উঠছিল, শুধু সেতারের ঝংকারের উদ্দাম ঝড়। সে কী বিরাট আনন্দ, মনে হতো যেন মালকোষের ঝংকারে ভগবানকেই পেলাম। কিন্তু এ পাগলামি গুরুজনরা সইবেন কেন, ক্ষুধার আর অজস্র প্রয়োজনের সংসার মানবে কেন ?

আমায় চাকরি করতে হবে। জীবনে উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত নাকি সেতার ছুঁতে পারব না আর, মা-বাবার মাথার দিব্যি।

বেশ, আমিও চলে এসেছি বাড়ি ছেড়ে। ওদের আশ মেটাবো, তারপর শুধু আমি আর আমার সেতার। তখন যে আমায় বাধা দিতে আসবে, —ইউ নো, ফ্রেণ্ড্—

পাগল আর কাকে বলে। রীতিমত কস্তুরী মৃগ। ছোকরার কপালে তাহলে আমারি মত দুঃখ আছে। গভীর মমতায় একাত্মবোধের আলোয় আমার সারা মন ছেয়ে গেল।—তাহলে চাকরি করছেন ?

—কই করলাম আর !—হাত উল্টে তেমনি মনোহরণ হাসি হাসলে সে। সাধনায় ভগবানকেও বুঝি পাওয়া যায়, কিন্তু চাকরি ? দিল্লীতে ছাত্র পড়িয়ে বহুদিন কাটিয়ে শেষে যাও একটা চাকরি পেলাম, তিন মাস পরেই ছাঁটাই। সেই টাকা দিয়ে বই কিনেছি—আই.এ.এস. পরীক্ষা দেব। সাহেব হবো। মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন খুশি হবেন। এরপর আমায় পায়কে ! ওই দেখুন, কত বড় ট্রাংক, সব শুধু বই !—বেদের দলের পাশে মস্ত কালো ট্রাংকটা আঙুল দিয়ে দেখায় সে—তার সেই অপরূপ চাঁপার কলি আঙুল।

—তাহলে এদিকে বই-এর পাহাড় নিয়ে ঘুরছেন কোথায় ?

—কপাল ! সব কপাল।—অদ্ভুত ছেলেটি হেসে উঠে কপাল চাপড়ায়।—

—বাড়ি থেকে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি মানুষ না হয়ে ফিরবো না। মোরাদাবাদে ব্যবসা করে এক বন্ধু, নতুন বিয়ে করেছে। কতবার লিখেছে ওর ওখানে যেতে। বই-এর পাহাড় নিয়ে এসেছিলাম ওর ওখানে, পড়াশোনা করব পরীক্ষা অবধি। এসে দেখি বেচারার ব্যবসা লাল বাতি জ্বেলেছে। নতুন বৌ নিয়ে কি দুর্গতি তার—

যত দেখছি তাকে, যত তার কথা শুনছি, ততই সে আমাকে আকর্ষণ করছে গভীর ভাবে। এই আঙুল, এই চোখ। সে কোনদিন আই.এ.এস. পাশ করে 'মানুষ' হবে কিনা বলতে পারব না আমি, কিন্তু ওই চোখের পিছনে জ্বালাধরা প্রাণ আর ওই আঙুলের নিপুণ আনা-গোনা যে বীণার তারে তারে একদিন যৌবনের রাগিণীর উদ্দাম আগুন ছড়িয়ে দেবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। তার জীবন-বীণার পরাণ আকুল করা দিশাহারা ঝংকার একদিন দিকে দিকে আকাশে আকাশে ফাগুন হাওয়ায় মাতন নিয়ে ধেয়ে যাবে—কোন সংশয় নেই আমার।

—আর সেতার? সেতার কোথায়!—আমার ব্যগ্র কণ্ঠের প্রশ্নে অবাক হয়ে তাকায় সে।

—সে তো বাড়িতে বাক্সে পুরে বন্ধ করে রেখেছি।—সে তেমনি মনো-লোভন হাসি হাসে, বিদ্রোহ বহ্নিতে জ্বলো জ্বলো চোখে আমার দিকে তাকায়,—আর আমার স্বপ্নকে বন্দী করে রেখেছি আমার বুকে। আপনি বুঝবেন, আমারি মত পাগল তো! নামটা আপনার কি বললেন ভুলে গেলাম ভাই—

বললাম।

—তা হলে এখন দিল্লী চলেছেন আবার—

—উঁহু! কে বললে,—সে কেবলি হাসে।—দিল্লীতে ভাত দিচ্ছে কে আমায়, মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিচ্ছে কে! ভারতবর্ষে নিশ্চিন্তে দুবেলা খালি পেতে হলে সাধু সেজে চলে যাও বড় তীর্থে—গয়া কাশী বৃন্দাবনে।

কিন্তু ওসব বড় ন্যাস্টি জায়গা। আমি চলেছি হরিদ্বার। দিল্লীতে থাকবো একবেলা, শুধু এক প্রস্থ গেরুয়া কিনবার জন্যে। আমার পরিচিত আশ্রম রয়েছে সেখানে! গেছেন কখনো হরিদ্বার? ছোট শহর, শান্ত পাহাড় আর অপরূপ গঙ্গা। শুধু শীত এই আর কি! আশ্রমে থাকবো। গীতা-টীতা পড়তে হবে একটু আধটু, গেরুয়া পরতে হবে। কুছ পরোয়া নেই। চমৎকার জায়গা। দেখতে দেখতে সেপ্টেম্বর মাস এসে পড়বে। দিল্লী নেমে আসব—

সুপুরুষ রাজীন্দর অবাক চোখে বসে বসে আমাদের তুই "তুবলা" বীরের আলাপ শুনছিল। চোখে মুখে তার না বোঝার ছাপ। নির্বাক বিস্ময়ে সে শুধু উজ্জ্বল দৃষ্টি লিকলিকে দেহ ছেলেটিকে দেখছে—

—কিছুই বললাম না তাকে—

নয়

দিল্লী !—দিল্লী পৌঁছেই সবাই দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাজীন্দর প্রীতিতে আমার হাতে চাপ দিয়ে পাঞ্জাবে চলল। গেরুয়া কাপড় কিনে শান্তি দত্ত হরিদ্বারের পথে উঠল।

রাত্রিটা নিউদিল্লী স্টেশনেই কাটাব ঠিক করলাম। গাড়ি থেকে নামতেই যে ভাবে ইংরেজী-বলিয়ে হোটেলের লোকেরা ছেঁকে ধরেছিল ! হোটেলে আর আমার এ বেশে যেতে ভরসা পাইনে। ওয়েটিং-রুমের সামনে প্লেটের লেখা মুছে গেছে, নিশ্চয় থার্ড ক্লাস। ঢুকে পড়ে টানা চেয়ারে শুয়ে পড়লাম।

মোটা হাতের ঠেলায় তন্দ্রা ছুটে গেল। টুপী-কোট-কম্বলের বেড়াজাল পেরিয়ে মাথা বের করে তাকাতেই চক্ষু স্থির। পাগড়ী বাঁধা দুই পিস্তল ঝোলানো পুলিশ সাহেব, সঙ্গে কনেস্টবল।

—এটা জেনানা ঘর, বাইরে চলে যাও।

—নিশ্চয়ই না।—আমি শুয়ে শুয়েই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠি।—

—কিছু লেখা নেই কেন বাইরে—

—নিশ্চয় আছে।—সে আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে প্লেটটা দেখায়।

—কিন্তু লেখাতো উঠে গেছে,—

—তবুও এটা জেনানাদের ঘর। বাইরে যাও—

অগত্যা সুখনিদ্রা ছেড়ে উঠে পড়তে হল। নইলে শ্রীঘর বাস। একচোখ ঘুম নিয়ে যখন বিড়লা মন্দিরের সামনে এলাম তখন গেট বন্ধ করবার তোড়-জোড় চলছে। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ি ভিতরে। চারধারে ঘরগুলো ভর্তি, একটু জায়গা নেই। উপরে আকাশ নীল, তারার দল ঝিকমিক করছে। কী শীত ! কিন্তু উপায় নেই। পাকা চৌকির উপর আসন বিছিয়ে শুয়ে পড়ি অগত্যা মাথামুড়ি দিয়ে। আশ পাশে ঘরভর্তি লোকগুলো হাসি-ফুর্তি করছে তখনো।

ঘুম ভাঙল সেতারের সুর ঝংকারে। বিড়লা মন্দিরের বিনি পয়সার সরাইখানা দেখতে চমৎকার, কিন্তু সংগীত সুধায় দরবেশদের তৃপ্ত করারও বন্দোবস্ত আছে নাকি? না, ওই যে বারান্দায় বসে এক ঘর-হারা সরাইবাসী ছোকরা তন্ময় হয়ে সেতার বাজাচ্ছে ভোরের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে। বাইরে এসে দাঁড়াই।

মানুষ দেখতে বেরিয়েছি আমি। এবার কদিন ধরে দেখব মানুষের স্মৃতিচিহ্ন দিল্লীর চারিধারে। কিন্তু মানুষ টানছে আমাকে অহরহ, থার্ড ক্লাস ট্রেনের বিচিত্র, বহু ভাবনায় রামধনুরাঙা মতো মানুষ। আর কী শীত এখনো ফেব্রুয়ারির শুরুতে। আরো উত্তরে যাবার মত কাপড় চোপড় ও পকেট আমার নয়। তাই আবার গাড়িতে চাপলাম,—যে পথে এসেছি।

উত্তর প্রদেশের মাঠে মাঠে শান্ত লক্ষ্মীশ্রী। ফুলেফলে মাঠগুলো যেন সাজানো বাগান। আর একটু পরে পরেই দেখো নীল আকাশে মুখ তুলে কালো ধোঁয়া ছাড়ছে কল কারখানার চিমনি। চিনি, ডাল, তেল, গম, কার্চ। বিহারের সঙ্গে তফাৎটা বড় বেশি চক্ষু পীড়া দায়ক। বিহারের ভিতর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলুক হুসহুস করে। তুমি দেখবে রুক্ষ মাটির প্রসার, সীমাহীন দৈন্যের পতাকার মত মাটির বুকে দাঁড়ানো কুৎসিত কুঁড়ে ঘরের সারি। দুপাশে নেই বাংলার শ্যামল প্রেমের আদিগন্ত প্রান্তর, উত্তর-বঙ্গের চা বাগানের সবুজ সুমসৃণ কার্পেট, আসামের নীল পাহাড়ের হাতছানি আর গহন জংগলের রহস্যময় কোলাকুলি। উত্তর-বঙ্গ ও আসামের বন্য প্রকৃতি কল্পনাকে অবাধে পাখা মেলে উড়তে দেয়ঃ পাথরের নুড়ি ভর্তি বিশাল গহ্বর শুকনো নদী, শীতে মৃত আর বর্ষায় ভীষণ; নিবিড় শালের বন আর সুদূর সোনা মাখা হিমালয়ের মৌন আহ্বান; হাফলঙের

আকাশছোঁয়া ত্রিকোণ পাহাড় আর মনুষ্যপদ বর্জিত গা-ছমছম-করা ছায়া-কালো রিজার্ভ ফরেস্ট।

কিন্তু এখানে ট্রেনের ভিতরে তোমার ক্লান্ত একঘেয়েমি দূর করে দেবে বিচিত্র মানুষের ভিড়ঃ বাইরের বৈচিত্রহীন সমতল থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাও ভিতরে, ওই দেখো, বসে দাঁড়িয়ে কারা।

তাই তাকাই ভিতরে!

রেলপথে কিছু একটা দুর্যোগ ঘটেছে আজ। অনেক দেরি করে অসময়ে চলছে গাড়ি। তাই নিয়ে ব্যস্ত আলাপ আলোচনা চলছে ভিতরে। নানান জল্পনা। এক একবার হঠাৎ মাঝপথে অনেকক্ষণ ধরে থেমে থাকে গাড়ি। জানলার পাশে আমি বসে। আমার পাশে রোগাটে কুচকুচে কালো অতি সাধারণ মানুষ একজন, যথারীতি খালি পা, গায়ে-মাথায় জড়ানো সাদা পাতলা কাপড়, হাঁটুর উপরে খাটো ধুতি। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সামনে। হয়তো কোন কুলি, মিস্ত্রি, কিংবা গরীব চাষী। কিন্তু যেই হোকনা কেন, তারও রয়েছে বিচিত্র ইতিহাস, হাসি কান্না প্রেম বিরহের জীবন। এ কদিনে জেনেছি পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীকে নিয়ে লেখা সম্ভব এক একটি মহাকাব্য, শুধু যদি দেখবার, উপলব্ধি করবার মত চোখ আর আত্মা থাকে আমাদের।

ওই যে আমার সামনে বসে জানলায় মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে একজন—মুখভর্তি দাড়ি, কপালের শক্ত রেখায় জীবনভর নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার পরিচয়, আধবোজা চোখের কোণে ব্যর্থ আক্রোশের কালিমা সঞ্চিত আর পুরু ঠোঁটের ভাঁজে ভাঁজে কত হতাশার কান্না। কী হতাশ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে শক্ত জানলায় মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে সে। আমি কি জানি ওকে, চিনি ওকে, বুঝি ওকে? ওকে নিয়ে কি কোনো হুগো আরেকটি অমর "লে মিজারেবল্"-এর সৃষ্টি করতে পারে না? সে চোখ নেই আমাদের, পণ্ডিত মূর্খদের, নেই সে দরদ, প্রাণঢালা সহানুভূতি—

আর ওর পাশেই বসেছে একজন অন্ধ বুড়ো। বার্ধক্যে শরীরের চামড়া ঝুলে পড়েছে। থেকে থেকে চোখ মুখের পেশীকে কিসের তাড়নায় সংকুচিত করছে সে, আর মাথা নাড়ছে। হাতে লাঠি, দৃষ্টিহীন চোখের নীলাভ মণি নিষ্ফল বাসনায় ঠেলে বাইরে বেরোতে চায়। পাশেই বসে আধবুড়ো স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় তার সতী সাধ্বী সহধর্মিনী। সচিব সখিনী যঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ! কী সুনিবিড় ভালবাসায় সে তার কাচের চুড়িপরা শক্ত হাতে বুড়োর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হাঁপানির টান আসছে বুড়োর। ওদের নিয়ে কি রচিত হতে পারে না অমর প্রেমের কাব্য, কি জানি!—যে অমৃত আলোকে ওদের হৃদয়ের রক্তাক্ত ভাষা পড়তে পারি সেই সহানুভূতির আলো মুছে গেছে আমাদের বুক থেকে—

প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝতে ছুটে বেড়াই কত তাজমহলে, রাজা-রাজড়ার ইতিহাসে—চোখে পড়েনা ক্ষুদ্র মানুষের বিরাট প্রেমের লীলা—

সুতরাং সেই পুরানো পন্থারই শরণ নিলাম। পাশের লোকটাকেই প্রথম পাকড়াও করি। বিড়ির বাণ্ডিল বের হয়,—পিয়ো!

কৃতার্থ হয়ে যায় সে। কুচকুচে কালো লোকটা। খালি-পা, চোখে ক্লান্ত চাহনি। সেই প্রথমে আলাপ শুরু করে,—কোথায় যাব, কোথেকে আসছি—

সে ইন্দ্রদেও দুবে। বাড়ি মুঙ্গের।—আসামে ছিলাম আমি। অফিসে পিওন ছিলাম। তিরিশ টাকা মাইনে, রেশন।—কালো আধবুড়ো লোকটা বিড়ি ফুঁকে,—উনিশ বছরের জোয়ান ছেলে বাড়ি থেকে জমিজমা দেখাশোনা করত, সাধ করে বিয়েও দিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন টেলি পেলাম, সেই আমার জীবনে প্রথম টেলি—ছেলেটি মারা গেছে। হঠাৎ, জ্বরে। সেই যে ছুটি নিয়ে বাড়ি এলাম আর আসাম যাইনি। বন্যায় রেল লাইন উড়ে গেল যে! সে কি যে-সে বন্যা বাবুজী, এমনটি তুমি দেখোনি। আমাদের অনেক

দেখতে হয়, সইতে হয়। কোশী, গণ্ডক নদীর বন্যা,—বাগমতী, লখেন্দী, মানুষ মারার বন্যা। মুঙ্গের জিলার উত্তর খাগারিয়ায় যে বন্যা হল বাবুজী, গোটা দেশ জলে ভেসে গেল। আমার গরু মোষ দুএকটি ছিল, সব চোখের সামনে ভেসে গেল! ঘরের চালের উপর বৌ বাচ্চা নিয়ে বসে রইলাম। নতুন নতুন ধানগাছগুলি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল, মুছে গেল। কাঁদিয়ে গেল আমাদের। আর সেকি শুধু আমার দেশে? আমার মায়ের দেশ, সেই দ্বারভাঙ্গা জেলার সমস্তিপুর মহকুমা—কী লক্ষ্মীদেশ—গণ্ডক, বাগমতী, জহুয়ারী আর কার্ড নদীর বানে সব ধান খেয়ে নিলে—

একটানা বলে জোরে বিড়িতে টান দিলে সে। ধোঁয়া বেরোল না দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিল ছোট্ট টুকরোটা।—তোমরা নিশ্চয় শহরে থাকো বাবুজী, তোমরা ঠিক বুঝতে পারবেনা। তোমরা কাগজে পড়, সিনেমায় দেখো, সাহায্য আসছে। কিন্তু সাহায্য কত আসতে পারে বাবুজী? তোমরা কি আমার মত সবাইকে গরু মোষ ফিরিয়ে দিতে পার, ভাঙা ঘর গড়ে দিতে পার, সারা বছরের ফসল তুলে দিতে পার? না, পারনা। তাই কাঁদলাম আমরা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে। অনেক বুড়ো বালবাচ্চা জ্বরে মরে গেল। আর কোথায় এসব ছেড়ে আসাম যাব চাকরি করতে, ছেলেটাও নেই।—একটা গভীর অনুশোচনার শ্বাস ফেলে সে হাত পাতে,—আর কয়টি বছর কাটিয়ে আসতে পারলেই পনেরোটাকার পেন্‌সন্ পেতাম সরকার থেকে, —রামজী জানে! দাও, বিড়ি দাও একটা—

সেই একই ইতিহাস আরো হাজার হাজার চাষীর মতই।—বানে অজন্মায় ক্ষেতের ফসল যায় নষ্ট হয়ে, কাঁচা টাকার লোভে তারা ছোটে দুরদুরান্তরের শহরে জংশনে কাজ করতে। কিন্তু মন পড়ে থাকে মায়াবিনী নদীর তীরে কোন নরম মাটির গ্রামে, একটু পয়সা জমিয়েই যার কোলে ফিরে যাবে সে—

মুখে একটা মাছি বসতেই আমার মুখোমুখি বসা দাড়িভর্তি মুখ 'লে মিজারেবল্' লাল চোখ মেলে তাকাল।

একটা ক্লান্ত হাই তুলে জানলা গলিয়ে বাইরে কী দেখল খানিকক্ষণ, তারপর উঠে দাঁড়াল। ট্রেনের গতি কমে আসছে, সামনেই স্টেশন—

লক্ষ্য করছিলাম লোকটাকে, না করে উপায় ছিলনা। লম্বা, জোয়ান, বাঁধানো শরীর। চরম বিতৃষ্ণার দৃষ্টি চোখে। একটা পোঁটলা জড়িয়ে সে ভিড় ঠেলে দরজার দিকে এগোয়। অন্ধবুড়োর বউ তার জায়গায় বুড়োকে শুইয়ে দিলে,—বুড়োর হাঁপানির টান উঠছে—

কিন্তু শুতে গিয়েই কাৎরে উঠল বুড়ো। ত্রস্ত কাঁপা গলায় বুড়িকে কি বললে বোঝা গেলনা। সোরগোল লাগিয়ে দিল বুড়ি। বুড়োর পকেটে টাকা ছিল, পাচ্ছেনা সে—

এঁ্যা? ওর পাশেতো বসেছিল এতক্ষণ ঐ "লে মিজারেবল্," তবে কি সে—

ছুটে গেলাম দরজার দিকে। নেই, হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে যেন লোকটা। ট্রেন গতি কমিয়ে আনলেও স্টেশন এখনো দূরে। বাইরে ঝাপসা চাঁদ মায়ার তুলি বুলিয়ে চলেছে মাঠে ঘাটে, নিরিবিলি গ্রামে, উঁচু গাছের জমাট কালো চূড়ায় চূড়ায়।

কিন্তু লোকটা নেই, মিশে গেছে ওই রহস্য ঘেরা চাঁদের আলোয়, পাখা মেলে উড়ে গেছে যেন সহসা ওই মিটমিটে তারাজ্বলা নীল আকাশে—

ফিরে এলাম। বুড়োবুড়ি তুমুল চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।—হায় হায়, এমন গরীবের সর্বনাশ করলে কেগো! সারাপথ এখন খাব কি, বাড়ি পৌঁছবার গরুর গাড়ির ভাড়াই বা দেব কোত্থেকে। হায় সীতারাম! বুড়ি কপাল চাপড়ায়, শুকনো কুঁচকানো তামাটে গাল বেয়ে নোনা জলের ধারা নামতে থাকে—

—কতটাকা নিয়ে গেছে বুড়িমা,—ধীর গলায় শুধালাম,—শো ? পঞ্চাশ ?

শো, পঞ্চাশ ?—বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে পুনরাবৃত্তি করে বুড়ি;—

—রাজা বাদশা নাকি, এতো টাকা নিয়ে ঘুরবো ? হায় রাম, তিনটাকা বার আনা ছিল, ঐ আমাদের সম্বল—

—রোজ কুয়া খুড়না, রোজ পানি পিনা। এই আরকি এদের অবস্থা,—হাসলে ইন্দ্র দেও।

গতমাসে রেস্তোরাঁয় বসে সখাদের সঙ্গে তিনটাকা বারআনা উড়িয়েছিলাম মনে পড়ল, কিন্তু ঐ টাকাই এ সংসারে কারো একমাত্র সম্বল হতেও পারে—

মৎ ঘাবড়াও বুড়িমা, টাকার ব্যবস্থা একটা হবেই, বলতে বলতে বেঞ্চিতে বসতে যাই, আঃ ! অমনি বুড়ির চেয়েও তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরোয় আমার গলা চিরে,—আমার জুতো ? এঁ্যা—

ক্যায়া বাবুজী ? ইন্দ্র দেও বিস্ফারিত চোখে তাকায়—

—জুতো, আমার জুতো,—আসন করে জুতো খুলে বসেছিলাম বেঞ্চিতে। তাড়াতাড়িতে খালি পায়েই দরজায় ছুটেছিলাম, খেয়াল হয়নি এতক্ষণ। হায়রে, রীতিমত খরচ করে যাত্রার উপযোগী করে তৈরি করে নিয়েছিলাম যাত্রা সহচরকে—

—বটে ! দেখো দেখো ভাই লোক, আর কারো কিছু গেল কিনা, ব্যাটা ডাকাত !—ইন্দ্র দেও ব্যস্ত হয়ে উঠে,—এতক্ষণ কি ঘুমই না দিল বসে বসে, আর আমাদেরি চোখের সামনে থেকে, রাম রাম,—দেখো, এক মস্‌লী সারে পানিকো গন্ধা কর দিয়া !—ইন্দ্রদেও যেন অন্তহীন বিস্ময়ে বোবা হয়ে পড়ে।

—ওর লম্বা দাড়ি দেখে আগেই আমার ভয় হয়েছিল,—বুড়ি চোখ

রগড়াতে থাকে—লেকিন আমার তিনরুপেয়া বার আনা, হায় হায়,—বুড়ো হাঁপানীর টানে কাবু হয়ে কাতরাচ্ছে এখন।

ক্লান্ত বিষণ্ণদৃষ্টি দুটি চোখ। কপালে পৃথিবীর নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার বলিরেখা। ঠোঁটের ভাঁজে অপ্রতিভ কঠোরতার আভাস। দাড়ির জংগলে ঘেরা মুখে নিরাশার আর অবিশ্বাসের কালো ছায়া—। চোখের সামনে ওর মুখখানা যেন জীবন্ত ভেসে উঠছে—

—লে মিজায়েব্‌ল্‌ !!!

রাতের মাথায় এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল। রাত হলে সবাই ঘুমোয়, সাপখোপ চোর ডাকাত ছাড়া, আর যারা সাধনা করেন তারা ছাড়া। আর যারা ভোগে—শরীরের নয়তো মনের যন্ত্রনায়। রাত বাড়তেই হু হু করে জানলাভেদ করে হিমেল বাতাসের ঝটকা ঢুকছে ভিতরে, কাপড়ে কম্বলে মাথা মুড়ি দিচ্ছে সবাই। বুড়োর হাঁপ ধরেছে। জেগে আছে বুড়ি বুড়োর রোগের তাড়সে আর তিনটাকা বার আনার শোকে। আমার বহু যাত্রা পথের বিশ্বস্ত সর্বংসহ বন্ধু পুরোনো জুতো জোড়ার জন্যে মন কেমন করছিল নিশুতি রাতে, ট্রেনের গতিশীল গর্জনে কান পেতে বেঞ্চিতে আসন করে বসে। ইতিহাসের ছাত্র যারা তারা জানে পুরোনো জিনিসের মূল্য কতটুকু—এই জুতো আমার কত উত্থান পতন দেখেছে, কত সুখদুঃখের সাথী হয়ে নীরব সাক্ষীর মত সব দেখে গেছে, হায়রে—

সুতরাং ঘুম আসছেনা আমাদের তিনজনের। বুড়ো উপুড় হয়ে বেঞ্চিতে পড়ে ধুঁকছে, গলা দিয়ে গর্‌গর্‌ আওয়াজ বেরোচ্ছে ক্রমাগত। হাঁপানির টানে অস্থিসার শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে উঠছে—নামছে। বুড়ি অসহায় চোখে তাকাচ্ছে, বুড়োর পিঠ ঘষে দিচ্ছে নীরবে—

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে বুড়িমা ?—ঘুম আসবেনা জানি, তাই আলাপ শুরু করি।

—বৃন্দাবন ! —বুড়ি চমকে চোখ তুলে তাকায় ! একটু থেমে আবার যোগ করে,—তীর্থে গিয়েছিলাম। গুরুজী আছেন ওখানে, বুড়ার একটা কবচও দিলেন। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না, দেখছো তো,—

—দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সে।

বুড়ো হুস্ হুস্ শব্দে বিকট শ্বাস টানে। ট্রেন চাঁদঢালা নিস্তব্ধতা ভেঙে হুস্ হুস্ করে এগোয় গাড়িভর্তি অমৃতস্য পুত্রাদের নিয়ে—

—ওঃ।—তা বড় ছেলে পিলে নেই তোমাদের ?—ঘুম কাতুড়ে গাড়ির ভিতরে আমার কৌতূহল কিলবিল করে মাথা চাড়া দেয়।

—ছেলে পিলে, হা রাম !—বুড়ির গলা চড়ে এবার, বাঁ-হাতে বুড়োর পিঠ ঘসতে ঘসতে তার চোখে-মুখে বিতৃষ্ণার ছায়া ঘনায়,—তিন লেড়কী, সব সাদী হয়েছে, মরদের ঘরে সুখে-দুঃখে আছে তারা। আর চার লেড়কা, বড়টি কলকাত্তায় হোটেলে কাজকারবার করছে। এর পরেরটি পাটনায় কোন অফিসে চৌকিদার, এর পরের লেড়কা আসামে কী কাজকারবার করছে সেই জানে। আর ছোটটি,—একটু থেমে দম নেয় বুড়ি,

—ছোটটি গাজা ভাঙ খেয়ে পয়সা উড়ায়। চিঠিপত্র লিখলে লেড়কারা অনেক পরে দুচার টাকা কভি কভি পাঠায় বৈকি। তাদের সবারইতো সংসার আছে। আজ সাত আট বচ্ছর তিন লেড়কা দেশে আসেনি। বুড়ো-বুড়ির বড় কষ্টে দিন কাটছে আজকাল—সীতারাম ! সীতারাম !

—বুড়ো ঠাকুর্দা কি করতো তাহলে,—আমি তবু শুধাই।

—এই, গাঁয়ে দোকান ছিল একটা। জীবন সুখেই কাটিয়েছি বুড়োর কালে। এখন বুড়ো দোকানে বসতে পারেনা, ছোট লেড়কা সব উড়িয়ে ছারখার করছে। তবু মাঝে মাঝে বুড়ো একটু ভাল থাকলে আমি দোকানে বসি। দুবেলার দুমুঠো ছাতুর জোগাড় হয়

কোনমতে,—বুড়ি শুকনো রেখায়িত মুখটা তুলে ধরে একবার। ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের প্রান্তে মুখটা মুছে নিয়ে কাচের চুড়ি পরা হাতে বুড়োর পিঠ চাপড়ায়,—জীবনভর দুঃখ পেয়ে পেয়ে আর ভাল লাগেনা। রামজীকে বলি আমার জন্যে কি যমও নেই? সীতামায়ির দুঃখে পৃথিবী ফেটে গিয়েছিল, কিন্তু আমার দুঃখে কেউ কাঁদেনা। কিন্তু বুড়াকে রেখে মরেও শান্তি পাবনা। আমি না থাকলে বুড়া একদিনও টিকবে না—

এমনি বসে বসে কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম জানিনা। চোখ মেলে দেখি ভোর হয় হয়। রাত্রি শেষের মধুর আবেশে কাৎ হয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে বুড়ো, দৃষ্টিহীন চোখ দুটো আধবোজা, মুখটা হাঁ হয়ে আছে, তার ফাঁকে হলদে দাঁত দুটো উঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ দেখলে ভয় হয়—বুড়ো মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। আর ক্লান্ত ধৈর্য বুড়ি মাটিতে পা রেখে বুড়োর কোমরে মাথা ফেলে দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে পরম নির্ভরতায়—গায়ে নেই কোন গরম আচ্ছাদন, শুধু ভারি ময়লা শাড়ি—
এদেশের মেয়েরা সত্যি সর্বংসহা। পাথর জলে পচেনা—

আমার গায়ে ঢলে পড়েছিল ইন্দ্রদেও, চোখ রগড়ে উঠে বসল। বুড়োর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল সে,—আরে, বুড্ঢা মরে গেল বুঝি!
আমারো সেই ভয়। নিথর নিস্পন্দ কাৎ হয়ে পড়ে আছে বুড়ো, শ্বাস নিচ্ছে কিনা বোঝা যায়না। অন্ধ চোখের সাদাটে পুঁটুলি যেন চোখের পাতা ঠেলে বেরোতে চায়, হাঁ করে আছে ব্যথা কুঞ্চিত মুখ। বুড়ি তেমনি পা ঝুলিয়ে বুড়োর কোলে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। চকিত আতঙ্কে ইন্দ্রদেও বুড়ির গায়ে ঠেলতে যাচ্ছে, অমনি ঘুমের ঘোরে

বুড়ো হঠাৎ ককিয়ে উঠল একটু। ইন্দ্রদেও-এর উদ্যত হাতটা চেপে ধরলাম,—মরেনি! বুড়িকে ঘুমোতে দাও একটু—

স্টেশনে গাড়ি এসে ঢুকতেই জাগরণের সাড়া জাগল গাড়ির ভিতরে। দরজার কাছে যারা অসহায়ভাবে জড়াজড়ি করে রাত কাটিয়েছে, হুড়মুড়িয়ে নিচে নামল সব। বুড়ো নড়ে উঠল, খড়খড়ে গলায় কাতর সুরে ডাকল,—এ লখীয়াকে মাঈ!

বুড়ি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চারপাশে তাকাল। জানলা দিয়ে দেখল রক্তিমাভ পূর্বাকাশকে স্টেশনের পাশের বিরাট গাছে স-কলরব পাখীর ঝাঁককে!—আঃ, ভোর হয়ে গেল—

—হুঁ,—বুড়ো কাৎরাতে কাৎরাতে উঠে বসতে গেল। কচি ছেলের মত আব্দারে গলায় দাবী জানাল,—চা খাবনা? গরম চা—

অসহায় চোখে তাকাল বুড়ি,—একটা পয়সাও নেই, কাল রাতে তোমার চাচার বেটা যে সব নিয়ে গেল! হা সীতারাম!

—তাই বলে চা খাবনা? ও লখীয়াকে মাঈ, চা খাব! গরম চা!—অবুঝ শিশুর মত বুড়ো যেন এখনি ডুকরে কেঁদে উঠবে—

ইন্দ্রদেও নীরবে শুনছিল। ওকে চাদরের তলায় পকেট হাতড়াতে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠি আমি—চা খাবে বুড়ো, বুড়িমাঈ। তুমিও খাবে, আমরাও খাব। এ্যাই গরম চা, ইধার—

বুড়ো আমার দিকে আন্দাজে তার নিস্তেজ শুকনো হাতখানি বাড়ায়। ব্যর্থ তাড়নায় চোখের সাদা পুঁটুলী ঠেলে ঠেলে উঠে, হলদে দাঁত বের করে সরল হাসি হাসে সে—

বাঁশী বাজতেই হুড়মুড়িয়ে আবার উঠে এল সবাই। মুখ ধুয়ে, চা খেয়ে। গাড়ি ছাড়ল। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পূর্বাকাশ সূর্য বন্দনায় আরো লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ। দরজার পাশে ওরা তুমুল সোরগোল তুলেছে। বাক্স-প্যাঁটরা বিছানার উপর যে যেখানে পারে বসেছে। হঠাৎ শুনি গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে তীক্ষ্ণ সুরেলা সুর।

ঘাড় তুলে তাকাই। ওদেরি মধ্যে একজন বই খুলে সুর করে পড়ছে। আর বাকি সবাই হাততালি দিয়ে আবৃত্তি করছে। সেই চিরকালের তুলসীদাস।

মন দুলে উঠল। সজীব উদার গলায় সুর করে পড়ছে একজন, ফিরিয়ে গাইছে বাকি সবাই, ট্রেনের চাকার শব্দের তালে তালে। মনে হল, যেন এই পথও এই গান শুনে জেগে উঠেছে যুগের জড়তা ভেঙে, শত শত বছর ধরে যে গান শুনে আসছে এই পথ :—হায় রাম! তোমার ওই নয়নলোভন মনোহর দুর্বাদলশ্যাম কান্তি দেখতে পাচ্ছি, এইতো আমার 'পরে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ! পাথর হয়ে ছিল যে অহল্যা, তোমার কল্যাণ পদস্পর্শে সেই আজ ধন্য হয়ে উঠল। তোমার করুণা অসীম, হে রঘুপতি—

সেই সুললিত সুরের ঐক্যতান খুশির ঢেউ তুলেছে সবার মনে। সবাই দুলে দুলে মাথা নাড়ছে নতুন প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত অহল্যার মত। বুড়ির ক্লান্ত বিতৃষ্ণার ছায়ামাখা শুকনো মুখে ফুটে উঠেছে গভীর প্রসন্নতার আলো, কুয়াসার জাল ছিন্ন করে যেমন সূর্যের পবিত্র রেখা দিগ্বলয়ে আলো ছড়ায়। অন্ধ বুড়ো লাঠি হাতে তুলে নিয়েছে এবার। রসবর্ণহীন আঙুলে লাঠির গায়ে তাল ঠুকছে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে, ভাঙা দাঁতের ফাঁকে খুশিতে জিব বের করে—

—হা রাম! বলো, বলো, তুলসী দাসের জীবন কবে এমনি প্রাণ চৈতন্যে ধন্য হয়ে উঠবে! হাত তালি দিয়ে তারা গাইছে। মূল গায়েন গলা ফুলিয়ে বইটা নাকের সামনে মেলে ধরেছে একেবারে, চোখ কুঁচকে সুর করে পড়ছে শুধু, আর লক্ষ্য নেই কোন দিকে—

আর তখনি দিগন্ত ভাসিয়ে নবজাত সূর্যের লাল আলোর ছটা দিকে দিকে বান ছুটিয়ে দিলে। বুড়োর চোখে মুখে এক ঝলক রোদ পড়তেই শিশুর মত আনন্দে হো হো করে হেসে উঠল হঠাৎ—

—প্রণতঃহোস্মি দিবাকরম !

সূর্য বিরাট। বিরাটের কাছে তুচ্ছ ছোটবড়র বাছবিচার নেই কোনো। যে প্রভাত সূর্যের আলোয় বাগিচায় লনে বসে টি-পার্টি দেয় বড়লোক, সেই আলোতেই গাছ তলায় বসে পরম নির্ভাবনায় গায়ের জামার উকুন বাছে পথের ভিখারী—

এই রাঙা মুহূর্তে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করলাম, রামায়ণ ভারতের আত্মার কতখানি জুড়ে রয়েছে। গঙ্গা আর রামায়ণ যে দিন থাকবেনা, সেদিন ভারতের সোনালী আত্মাকে আর খুঁজে পাবেনা তুমি।

ভাগীরথী ধারার মতই বড় আপন, অনন্ত জীবনদায়িনী সেই অমর কাব্যনির্ঝর ধারায় ভোরে উঠেই অবগাহন করছি সবাই। এক সময় দেখি কোন মুহূর্তে সবাই আবৃত্তিতে যোগ দিয়েছে আত্মভোলা হয়ে। সুর মুগ্ধ সাপের মত আমারো মাথা দুলছে তালে তালে—

তুলসী দাস ! তোমায় প্রণাম—

আপার ক্লাসের যাত্রীরা যেন চীনে মাটির বাসন। বিলিতে কায়দায় তৈরি, সুন্দর কারুকার্য করা নিখুঁত দামী জিনিস। কিন্তু এর সাথে প্রত্যাহের সহজ অন্তরঙ্গ আদান প্রদান চলেনা। ক্ষণস্থায়ী চায়ের আসরে ভদ্রতা মাফিক একটু মুখ টেপা হাসি। বিন্দুমাত্র আঘাতেই চীনে মাটির জীবনান্ত ঘটবার সম্ভাবনা, তাই তাকে ঝেড়ে মুছে সন্তর্পণে তুলে রাখো আলমিরায়, ধনগৌরব দেখাবার মত দর্শনীয় বস্তু।

আর থার্ড ক্লাসের ওরা যেন প্রত্যাহের অতি পরিচিত কাঁসা পিতলের বাসন কোসন। এদের ছাড়া চলেনা তোমার একটি মুহূর্ত, যদিও দামী চায়ের আসরে তাঁদের ঠাঁই নেই। নিবিড় আত্মীয়তায় তাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলি, সম্পর্ক ভাঙবার ভয় নেই। শো-কেসে রেখে এদের দিয়ে কৌলীন্য গৌরব দেখানো যায় না, কিন্তু সিল্কের পর্দার

আড়ালে আগুনে পুড়ে পুড়ে এরাই জোগাবে তোমার সব কিছু, যা চীনে মাটির দামী চিত্র আঁকা পাত্রে তুমি পরিবেশন করবে সগৌরবে— আজ ভোরে যদি চীনে মাটির দলে থাকতাম তবে ঘুম ভেঙে শুভদৃষ্টি হতেই বলতো,—গুড মর্নিং, হাউ ডু ইউ ডু!—তারপর অতি সাবধানে দুএকটি বাক্যালাপ, কেমিক্যাল্ ব্যালানস্-এ ওজন করা একটু হাসি, দুএকটি নাম করা উদ্ধৃতি—। যেন ফ্লোরেসেণ্ট্ আলোর নিচে কাগজের ফুল সামনে রেখে প্রকৃতির কবিতা লেখা—

আর এখানে যেন বাধা বন্ধনহীন ফাগুনের উতলা হাওয়া। নিষ্কলুষ সূর্যের আলোয় অজস্র বনফুলের মাঝে প্রকৃতির চির পরিচিত নিঃসংশয় আত্মপ্রকাশ। মাথার উপরে নেই নীল আকাশ ছাড়া কোন আচ্ছাদন, নিচে নেই নরম মাটি ছাড়া মোজাইক্ মেঝে। এখানে তুমি মুক্ত, তোমার মন প্রাণ খুলে দাও, শ্রেষ্ঠন্মন্যতার বেড়া তুলে দাও,—দেখবে তোমার পাশে খাঁটি সব প্রাণ খোলা মানুষ, তোমার প্রত্যহের অন্তরঙ্গ আপনজন—

গাড়ির গতি কমে আসছে। স্টেশন। গাড়ি থামল, গান ভাঙল। স্বপ্ন টুটে গেল।

দশ

সুতরাং ত্রিবেণী সংগমে নগ্নপদে অবতরণ। কিন্তু কতক্ষণ আর খালি পায়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখা যায়। শহরে গিয়ে সব আগে জুতো একজোড়া কিনতে হল। এদিকে শীতের সাথে সাথে পকেটের দৌরাত্ম্যও কমছে—

এলাহাবাদের দুরাত্রি কাটল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। চমৎকার ঘর পেলাম একখানা। আলো, বাতাস, জল, দুদিনেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠে আবার পথে নামলাম। প্রথমে যেতে হবে টেলিগ্রাফ অফিস, টাকা না এলে বাড়ি ফেরা হবেনা আর। ভর দুপুরে টেলিগ্রাম করে এগোলাম রেল স্টেশনের দিকেই। ওখানকার বুক স্টলের দিকেই ঝোঁক। খোলা গেট পেয়ে দিব্যি লাইন পেরোতে যাব, হুড়মুড়িয়ে দিল্লীর ট্রেন এসে হাজির। থামতে হল কিছুক্ষণ, ট্রেন ছাড়লে পর এগোলাম।

—আপকা টিকিট ?—হায় ভগবান! এযে আরেক টিট্টি বাবু! আহা, ওরা আমায় কী ভালই না বাসে, মোলাকাৎ হলেই সম্পর্ক পাতাবার মতলব।

টেলিগ্রামের ভাষ্য ও ভাষা নিয়ে মনে বেশ একটা খটকা দানা বাঁধছিল ক্রমশ। কড়া রোদে ওভার কোট গায়ে মেজাজ ছিল তিরিক্ষি, প্রায় ভেংচি কেটে উঠলাম,—হোয়াট টিকেট!

বুঝলাম, পাথরে আঘাত হানলে আঘাত ফিরে পাওয়া যায়! মোটা-সোটা টিট্টি বাবু চোস্ত হিন্দিতে গজে উঠল,—টিকিট না দিলে দিল্লী থেকে ভাড়া আদায় করব, ওসব সিনেমার কায়দা বহু দেখি আমরা—

মেজাজ চড়ে গেল আচমকা। রোগা মানুষ রাগলে কসাইর কুকুর।

রীতিমত লোক জমে গেল চারপাশে। কিন্তু রাজপুরুষের সংগে পারব কেন আমি, নিয়ে গেল অফিস ঘরের ভিতরে হোমড়া-চোমড়া কারো কাছে। সেই এক কথা, দিল্লী থেকে ভাড়া দিতে হবে। বই কিনতে আসা সব কিছু বাজে—

—বটে!—হঠাৎ খেয়াল হল। গম্ভীর ভাবে পকেট থেকে টেলিগ্রামের রসিদ বের করে দুর্ধর্ষ রাজপুরুষদের বিস্ফারিত উৎক্ষিপ্ত নাকের সামনে তুলে ধরলাম,—

—এই দেখো আমার প্রমাণ,—একঘণ্টা আগে এখান থেকে টেলিগ্রাম করে ট্রেনে কখন দিল্লী থেকে আসতে পারি আমার মোটা মাথায় একটু দয়া করে ঢুকিয়ে দেবে কি?

এবার ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। টিট্টি বাবুর মুখ চূর্ণ।—এবার যেতে পার। বই কিনো কি যা খুশি করোগে তোমার,—সাহেব ফাইল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বললেন।

বাইরে এসে দাঁড়ালাম। টিট্টিবাবু আমার পশে এসে দাঁড়াল। অপমানে রাগে হুলো বেড়ালের মত ফুলছে বেচারা!—আর ইউ এ বেঙ্গলী?—যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে প্রশ্ন হল—

—ইয়েস! হোয়াই নট,—মুখ ঝামটা মেরে আমিও সদর্পে চলে এলাম।

হয়েছে, ঢের হয়েছে, আর এলাহাবাদে নয়। এখানে দেখছি সবই এলাহি কারবার। বই কিনতে গেলে পেয়ারের লোকেরা ধরে টানাটানি করে। যাই, কিছু ধম্মটম্ম করে আসি গে। ইহ জন্মটাতো আত্মীয় স্বজন শুভার্থীদের কাঁদিয়ে বানের জলে সাহিত্যের ভেলায় করে ভাসিয়ে দিলাম, পরলোকের সোপানের গোড়ায় একটু সিমেণ্ট দিয়ে আসিগে—

রাত্রে ট্রেনে চড়লাম। জানলার পাশেই বসেছে এক পাঞ্জাবি নওজোয়ান। স্বাস্থ্যের আর যৌবন উজ্জীবিত রূপের প্রকাশ দেহ

জুড়ে। আমার একশো পাউণ্ডের পৈত্রিক প্রাণ ওর পাশেই সবুজ বেঞ্চির উপর রাখলাম। সে ত্রস্তে এক ঝলক আমার দিকে চোখ ফেলেই আবার বাইরে মাথা গলিয়ে নিবিষ্ট মনে কী দেখতে লাগল। নিতান্ত ভাল ছেলের মত আমিও ওব দৃষ্টি অনুসরণ করতে গিয়ে ধাক্কা খেলাম। এতরূপ! কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায় এতো রাশি রাশি রূপ যে কেউ একই অঙ্গে ধারণ করতে পারে এর আগে ভাবিনি। প্ল্যাটফর্মে উজ্জ্বল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে সপ্তদশী মেয়ে, পাশে নিশ্চয়ই রয়েছে ওর সঙ্গের লোক। বিস্তর মালপত্র। কিন্তু তার জ্বালা ধরানো রূপের ছটায় দিনের আকাশের তারার মতই তারা অবলুপ্ত। ছোকরার তন্ময়তার তারিফ করলাম। চোখ ফিরিয়ে আমার একশো পাউণ্ডের অতি প্রিয় হাড্ডি-মাংসের একটু আরামের দিকেই মন দিলাম আমি। হঠাৎ বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে সচমকে মাথা তুলে তাকাই। ছোকরা কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কি, পয়সা চাইবে নাকি? সিগারেট? আমি বিব্রত মুখে তার ব্যথাতুর সুন্দর মুখে নীরবে তাকিয়ে থাকি।

—চলে গেল!—আরেক প্রস্থ নিদারুণ বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস।

—কে? এঁ্যা, কে চলে গেল!—আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি রীতিমত।

—কেন, দেখোনি? ওই যে এতক্ষণ ওপাশে লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। ওহো,—ছোকরার চোখে মদির স্বপ্ন ঘনায়। তার অস্থিমজ্জায় সমস্ত যৌবনজ্বালা আরেকটি মহার্ঘ দীর্ঘশ্বাসে নিঃশেষে উড়িয়ে দেয় সে।—আহা, চলে গেল!

—ওঃ!—খুব নির্লিপ্ত গলায় বলে উঠে নতুন জুতোর বেল্ট বাঁধতে মন দেই আমি। এবার ঘুমিয়ে পড়লেও যদি জুতো চুরি হয়? আর বিশ্বেস নেই কাউকে।

—অমন বহু দেখেছি পথে ঘাটে। এ দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য সত্যি চমৎকার!—বিজ্ঞের মত আমি মতামত জানাই।

—হোয়াট ডু ইউ মীন্ !—ছোকরা এই মারে কি সেই মারে !—
—দেখোনি ওর পরনে পাঞ্জাবি সালোয়ার ! ও পাঞ্জাবি !
তামাম হিন্দু স্থানের যতো সুন্দরী মেয়ে সব পাঞ্জাবি ! শুধু মেয়ে নয়, পুরুষও। হ্যাঁ, সেণ্ট পারসেণ্ট ! ডু ইউ ডিজ এগ্রি ?
ওর উগ্রমূর্তি দেখে ডিজ এগ্রি করবার মত দুঃসাহস কম জনেরই হবার কথা। জোয়ান ছেলে, তার রূপ দেখে কচি মাথায় ভিরমি লেগেছে। কিন্তু আমিও রোগা বামুন, দুর্বাসার জাত। নিচু গলায় বলি—তা সালোয়ার অনেকেই পরে আজকাল, যেমন বাঙালীর শাড়ি পরছে সবদেশে—
এতোটা ওকালতি প্রত্যাশা করে নি ছোকরা। আকাশ জোড়া বিস্ময়ে থ' মেরে খানিকক্ষণ আমার চোখে চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর সজোরে শরীর মোচড় দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসল।—তোমার অজ্ঞানতা যেন ভগবান ক্ষমা করেন। জেনে রেখো, যে খুব সুন্দর, সেই পাঞ্জাবি, —ইয়স্ !—সে সিগারেট কেস্ খুলে বসল। ট্রেন ছাড়ল।
সামনে যে গোবেচারী লোকটি বসে বসে সকৌতূহলে এতক্ষণ আমাদের আলাপ শুনছিল সে আবার মুখ বাড়াল। অতি সাধারণ মানুষ, জুতো নেই, গরম কাপড় নেই, আরো হাজার জন পথের সাথীর মত একজন। কালো চেহারা, লম্বা রুখু চুল, ঝকঝকে একজোড়া চোখ। মাঝারি গোঁফ।
—কোন দেশে বাড়ি আপনার ?—সে শুধায়।
—কেন বলোতো ?—হেসে বিড়ির বাণ্ডিল এগিয়ে ধরি। প্রেমিক সৌন্দর্য-তত্ত্বজ্ঞ ছোকরা বাঁকা চোখে তাকিয়ে সিগারেট ফুঁকতে থাকে।
বিড়ি ধরিয়ে হাসে লোকটা। রসিক !—এমন পোশাক নিয়েছ আর এ্যাইসা হিন্দি তোমার,—না বাঙালী, না হিন্দুস্থানী, না ফার্সী—তোমার কিছু বোঝা যায়না।

হ্যাঁ, তাহলে ব্যাটা আমার বহুরূপী চেহারার মর্ম বুঝেছে। ভালো লাগে তাকে।—আর তোমার ব্যাপার কি, বলো।—টুপিটা আরো ভাল করে মাথায় বসাই।

—এলাহাবাদে সিংহ উকিলবাবুর বাড়ি রান্নাবান্নার কাজ করি আমি!—সজোরে একবার মাথা নাড়া দিল সে। সুদীর্ঘ সুস্পষ্ট টিকিটি নেচে উঠে তার পাচকত্বের লাইসেন্স্ আছে বুঝিয়ে দিল। —ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি, ভাইর সাদী। তা হুজুর,—এবার সে সুবেশ সুদেহী ছোকরাটিকে ধরল,—আপনি একটানা কখন থেকে সিগারেট খেয়ে চলেছেন। এতো খান কিসের জন্যে, বলুন দেখি—

প্রেমিক ছোকরার তখন তুরীয় ভাব। ক্ষণেক আগে দেখা মুখের স্বপ্নে কোন নন্দন কাননে পেথম ধরে বিহার করছিল সে। চমক ভেঙে বোকার মত তাকাল। ঠাকুর মশাই টিকি দুলিয়ে আবার তার প্রশ্ন হানলে। চোখে চোখে তাকালে।

—ওঃ, সে তো আনন্দের জন্যে! হ্যাঁ আনন্দ,—ছোকরা থতমত খেয়ে জবাব দেয়।

—ঠিক, ঠিক, গীতায় ভগবান বলেছেন,—স-টিকি মাথা নাড়তে নাড়তে গড়গড় করে সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে যায় সে, একবর্ণও বুঝতে পারিনা। সব শেষে সায় দেয় সে,—দুনিয়ার সব কিছু আনন্দের জন্যে। ঠিক, ঠিক—ঈশ্বর কি মায়া, কহীঁ ধূপ কহীঁ ছায়া। রাম! রাম!

আর এলাহাবাদের সিংহ মশাই উকিলের ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় না। কে জানে, হয়তো হব্স্ সোপেনার পড়া আছে তার! চোখ বুজলাম।

স্যুটপরা রূপপিয়াসী ছোকরা এবার ধীরে ধীরে ঢুলতে ঢুলতে আমার গায়ে ঢলে পড়েছে। মাঝে মাঝে হুঁস হতেই পড়ন্ত মাথাটাকে সজোরে টেনে নিয়ে সে ফিসফিসিয়ে উঠে,—সরি!

—আহা বেচারি! এলাহাবাদ স্টেশনের সালোয়ারের এমন প্রাণঘাতী

ঝটকা সামলাতে বেশ কদিন লাগবে তার। করুণা হল। বয়েসও আর এমন কি ! আঠারো উনিশ বড় জোর। একটানা ওর ঝুলন্ত মাথাটা আমার কোলে ফেললুম, বুক চাপড়ে বললুম,—ডোণ্ট্ মাইণ্ড— আমার ট্রেনে ঘুম হয় না, তুমি ঘুমোও—

কোলে মাথা রেখে সরলদৃষ্টি জ্যাবজ্যাবে চোখ মেলে আমার মুখে তাকায় সে,—এমনি ঘুমুব ?

আহা, একেবারেই ঘায়েল হয়ে গেছে দেখছি ! করুণায় গলে যাই আমি। ঠিকানা জানা থাকলে সালোয়ার পরা সপ্তদশীর সঙ্গে শ্রীমানের মিলনের ঘটকালি করতাম নিশ্চয়। রক্ত মাংসের শরীর তো আমারও, এর দুঃখ কত সইবে আর। সব ভুলে গিয়ে নিবিড় স্নেহে ওর চওড়া বুকে চাপড় দিই,—হ্যাঁ, হ্যাঁ ঘুমোও তুমি—

খেলার শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত দুষ্টু ছেলের মত গাঢ় ঘুমের আবেশে পরম নির্ভাবনায় চোখ বুজল সে—

পরম জ্ঞানী ঠাকুরটি চাদরের তলা থেকে আগুনের আঁচলাগা সবল হাত বের করে আমার নাকের সামনে ধরে বিড়বিড় করে উঠে,—দুনিয়ার সব কিছু আনন্দের জন্যে, খাওয়া ঘুম সব, সব !—একবার আড়চোখে ঘুমন্ত শ্রীমানের দিকে তাকায়,—নওজোয়ানী, মহব্বত, সব, সব ! যাদৃশী ভাবনা যস্য, এ্যাঁ ? দাও ফার্সী না হিন্দি বাবু,একটা বিড়ি দাও— এরপর বিড়িতে টান দিয়ে কপাল কুঁচকে নাক ফুলিয়ে উকিল বাবুর ঠাকুর হাত দেখতে শুরু করলে। ঘরে বসা লোক কজন লোভী কাকের মত মুহূর্তে ওকে ছেঁকে ধরল। সবাই নিমেষে ভাগ্যের ক্রীতদাস হয়ে পড়ল। ভবিষ্যৎ জানতে চায় সবাই। আড়চোখে ঠাকুরটি তাকাচ্ছে আমার দিকে, আর গড়গড় করে বলছে,—সামনের মাসের দশ তারিখ থেকে শনি আসবে ধনক্ষেত্রে। খুব সাবধান হয়ে চলো সাথী। আর আজ থেকে ঠিক একবছর সাত মাস বিশ দিন পরে তোমার জীবনের সেরা কাণ্ডটা ঘটবে জেনো—

তারপর শ্রোতার কানের কাছে মুখ নিয়ে অতি গোপন কোন খবর জানিয়ে দিল চোখ গোল করে! বিড়ির বাণ্ডিল বেরোল। পয়সাও বেরুবে এরপর।

—আমার হাতটা আগে পণ্ডিতজী! এইতো নেমে যাচ্ছি সামনে!—ব্যগ্র ব্যাকুল স্বর ঝরে পড়ে বুড়োটে লোকগুলোর কণ্ঠে। নাকের সামনে থেকে প্রায় আধ ডজন প্রসারিত হাত ঠেলে ঠেলে বিনীত গাম্ভীর্যে হাসে পরম জ্ঞানী পাচকটি,—আরে, সবুর! ভাল কাজে তাড়াহুড়ো করলে চলে নাকি,…হ্যাঁ, এই যে রাহু কেতুর পূর্ণ দৃষ্টি তোমার সন্তানের ওপর। হাঃ হাঃ হাঃ, বলো ঠিক কিনা—

গরীব বেচারিদের ঘরে অসুস্থ টোটাফোটা সন্তানের অভাব থাকবার কথা নয়। তারা শ্রদ্ধায় মাথা দোলায়।—ঠিক পণ্ডিতজী! গেল সাল থেকে ছোট ছেলেটা পিলে ফুলে ভুগছে। জল হচ্ছে পেটে। হয়তো বাঁচবেই না।

গভীর আত্মতৃপ্তিতে ঠাকুর মশাই একটা শ্বাস ফেলে আমার চোখে তাকায়। হেসে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। উকিলের বাড়ির ঠাকুর, ধান্দামান্দা করে মক্কেল ঠকিয়ে বেড়ানোটা রপ্ত করেছে বেশ। বিজ্ঞান দ্রব্যগুণ স্বীকার করে।

যে যা শুনতে চায়। ছোকরা একজন হাত বাড়াতেই সে লাফিয়ে উঠল। আরে, আর তিন মাস পরেই এক বহুৎ খুবসুরৎ জেনানার সঙ্গে তোমার মহব্বৎ হবে। জরুর।

জরির কোট গায়ে ছিপছিপে কালো ছোকরা। পেশায় নাপিত কি ধোপা হবে। লজ্জায় বেগুনী হয়ে আমতা আমতা শুরু করে বেচারি। গাড়িময় হাসির বান উঠে। চোখ বুজলাম।

গাধার মত না শুয়েই ঘুমিয়ে ছিলাম। চোখ যখন মেললাম তখন প্রজ্ঞাবান উকিলের ঠাকুর অন্তর্ধান করেছেন। টুণ্ডলায় এসে সৌন্দর্য বিশারদকে ডাক দিলাম,—ওহে, ট্রেন বদল করতে হবে যে!

সেই মোহ ঘুম থেকে তাকে জাগানো এক কেলেঙ্কারি। কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে হতচ্ছাড়ার উপর, নইলে দিব্যি কোল থেকে মাথাটা নামিয়ে রেখে চলে আসতে পারতাম।

অনেক কষ্টে শ্রীমানকে ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে ট্রেনে চড়লাম আবার। কিন্তু ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। কলকলিয়ে হুড়মুড়িয়ে একপাল নিপুণিকা আধুনিকার দল যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে আমাদের কামরায় উঠে পড়ল। আর তক্ষুনি ছাড়ল গাড়ি। ছোকরা ক্ষেপে গেল। কি যে করি! পেটকাটা ব্লাউজ গায়ে। পরনে বিচিত্র রঙের হৃদয়পাল্টানো সব আগুনে শাড়ি, চোখে ঝিলিক, হাতে সরু ফিতায় বাঁধা ঘড়ি। রীতিমত মার মার কাট কাট কাণ্ড। ছোকরা লাফ দিল ব্যাঙের ছানার মতন। উত্তেজনায় তার সুন্দর মুখ লাল, স্বর কম্পমান,—চলো, আমাদের সিট ওদের ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।—

—পাগল!—আমি ওর হাত ধরে বসিয়ে দি,—গোটা গাড়ি খালি পড়ে আছে, দেখতে পাচ্ছোনা?

—ওঃ, আই সী!—এতক্ষণে তার মালুম হয়! একমুহূর্ত কি চিন্তা করে সে। পাতলা ঠোঁট দাঁতে চেপে ধরে, তারপর হঠাৎ আমার কাঁধ চাপড়ে বলে,—তোমার সঙ্গের কাগজগুলো কই। এ্যাঁ, শীগগির বের করো—

ওদিকে তখন নিপুণিকার দল কলহাস্যে মুখরিত করে তুলেছে গাড়ির ভিতর। কাঁপা হাতে থলি হাতড়ে ছোকরা তার সিনেমার ম্যাগাজিন বের করে একতাড়া। তারপর আমার পাশে ওদের মুখোমুখি বসে সদর্পে শুরু হয় সিনেমার আলাপ,—দেখেছো, এই দেখো, অমুকবালার পোজখানা,—এল্যুরিং!—

অমুকবালা নাম্নী স্বর্গের পরীর নাম কানে যেতেই ললনাদের কলহাস্য থেমে গেছে আচমকা। ছোকরা উৎসাহে লড়াইর ঘোড়ার মত চড়বড়িয়ে উঠে। মুখে খই ফুটে যেন!—আর অমুক কুমার অমুক

দেবীব সঙ্গে কোন ছবিতে নামবে না, ঠিক দেখো। সেদিন এ্যাইসা এক কেলেঙ্কারি হয়েছে বোম্বাইতে, হলিউডকেও হার মানিয়ে দেবে, ছোঃ ছোঃ—আমাকে উদ্দেশ করেই কথা বলছে ছোকরা, কিন্তু বাঁকা চোখের দৃষ্টি ওদিকে ঘুবছে—

সুযোগ পেয়ে প্রায় কানে কানে শুধাই আমি,—ওরাও কি সবাই পাঞ্জাবি ?—ছোকবা সুন্দরীদের আরেক দফা দেখে নেয়, তারপর আর আমাব দিকে ফিরেও তাকায় না। রঙচঙে সিনেমার কাগজগুলো নিয়ে নানান ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করতে থাকে। যেন বেডিও এ্যাক্‌টিভ হয়ে গেছে ছোকরা।

ওকে দেখে পুবানো কথাই মনে জাগছিল। আফিম আর চণ্ডুর মৌতাতে চীনেব একটি জেনারেশন গোল্লায় গিয়েছিল, কয়েক যুগ নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছিল তারা। আর হিন্দুস্থানের সিনেমার নেশায় আজকের নওজোয়ান কত যুগ বুঁদ হয়ে থাকবেন একমাত্র ভারতভাগ্য-বিধাতাই বলতে পারেন। অন্তত আন্‌রেস্ট্রিক্‌টেড্‌ হিন্দি ছবির নামে যে দো-পেঁয়াজী অনবরত ভারতের বালক কুলের কচি পাকস্থলিতে জমা হচ্ছে, গেস্ট্রিকে অকাল মৃত্যু রোধ করা ধন্বন্তরিরও অসাধ্য হবে কালে।

কষ্ট হল। ছোকরা আব কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেনা যেন। একরাশ চুম্বক যেন অনবরত তাকে ছোট্ট অসহায় সূঁচের মত টানছে। নিতান্ত আমার উপস্থিতি তাকে যেন ছুটে যেতে বাধা দিচ্ছে। এমনি অশ্রান্ত ছটফটানি আর ললনাদের কলহাস্যের মাঝে ট্রেন থামল এসে আগ্রায়। ওরা নামল।

স্প্রিংএর মত লাফিয়ে উঠে ছোকরা।—নিশ্চয় নতুন এসেছে ওরা, তাজমহল দেখবে। আমার ওদের যতটুক সাধ্য সহায় সাহায্য করা উচিত, কি বলো ?—একটানে সবগুলো সিনেমা পত্রিকা বগল দাবা করে কালবিলম্ব না করে সে ওদের পিছনে ছুটল।

তাইতো, বলে পাশে বসে মানুষ চিনতে হয়। আর সোনা কষ্টি পাথরে ঘষে। ঝকঝকে রোদ্দুরে চারপাশে খুঁজেছি তাকে। যতক্ষণ ছিলাম তার ছায়াও দেখিনি। বাছা যে বলেছিল দিল্লী যাবে! মরুক গে,—আমি মথুরার পথে রওয়ানা দিলাম।

কবে কোন এক গান শুনে ভাল লেগেছিল। গায়িকার মধুঝরা কণ্ঠের সংগে কল্পনা উদ্দাম হয়ে পুষ্পমাল্যে সাজানো অপরূপ রথের ছবি এঁকেছিল,—'মথুরার পথে রথ চলে গেছে,' ইত্যাদি। ব্যাপার দেখলাম তাই। কর্মবহুল জীবনে পেনসন নিয়েও পেটের দায়ে অথবা সরকারী পরিভাষায় "পাবলিক সার্ভিসের" খাতিরে আবার অনেককে ভাঙাচোরা গতর খাটাতে হয়। তেমনি এক বয়োবৃদ্ধ শ্রান্ত হাড় জিরজিরে বাস্ যাবে মথুরায়। ভাড়া?—কুল্লে দশ আনা। খুশি হয়ে চড়ে বসলাম। ফাঁকা গাড়ি, হোকনা বুড়ো খড়খড়ে। একটা মায়া লাগল কেমন। কিন্তু সময় বয়ে যায়। গাড়ি ছাড়েনা যে! ড্রাইভার দুজন, একজন কন্‌ডাক্‌টর। তারা আশ্বাস দিলে 'পাসিঞ্জার' এলেই ছাড়বে। দুপুরের গরমে হাঁস-ফাঁস করছি রীতিমত।
শেষ পর্যন্ত বহুক্ষণের চাওয়া পাসিঞ্জাররা আসতে লাগলেন একে একে। মুণ্ডিতমস্তক, মুখে কপালে চন্দন তিলকের ছড়াছড়ি। কেউ আপাদমস্তক লাল, কেউ হলদে। মুখে বিগলিত হাসি। চোখে নির্লিপ্ত ভাবলেশহীন দৃষ্টি। মেয়েদের পরনে বিরাট ঘাগরা, কাবুলীর সালোয়ারের মতই তার ঘোর প্যাঁচ। এনারা যাবেন বৃন্দাবন। মুখের দুপাশ বেয়ে পানের লাল ধারা নামছে—
রাষ্ট্র ভাষায় যদিও লেখা ছিল "১৭ জন বসিবেক", শেষ পর্যন্ত হলাম বাষট্টি। পেন্‌সেন্ ভোগী বাস্ নড়তেই পারে না। বহু সাধ্য সাধনায় নৌকার মত দুলতে দুলতে এগোল। বৈষ্ণবদের গলার তাড়সে আর শ্বাসরোধী ভিড়ে প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে উঠল।

হঠাৎ ক্যাঁচ করে থামল গাড়ি। ওপাশে এসে গেছে আরেকটি গাড়ি। তিনজন পুলিশের লোক নেমে এসে ড্রাইভারদের সঙ্গে তুমুল কাণ্ড লাগিয়ে দিলে। দ্বিগুনের উপর লোক নিয়েছে ব্যাটারা। গাড়িতে সাতাশজন রেখে বাকি সবাইকে নিচে নামিয়ে দিলে পুলিশ। জীবনে বহু ক্ষেত্রেই 'সিলেক্‌শন্' পাইনি, এবারে পেয়ে গেলাম। নির্লিপ্ত বৈরাগীরা মাটিতে বসল লাল হলদে পোষাক নিয়ে, পঞ্ছী আর দরবেশের আবার চিন্তা ভাবনা কিসের। যেখানে বসলে সেইতো তোমার ঘর—
ওরা গান ধরলে, বৃন্দাবন কি কুঞ্জ গলিমে—
ওদিকে বাকবিতণ্ডা গালাগালি চরমে উঠেছে। ছোট ড্রাইভার দেখি চোখের ইসারায় বৈরাগীদের অভয় দিচ্ছে,—ঘাবড়াও মৎ—
বড ড্রাইভারকে হাত বেঁধে টেনে হিঁচড়ে পুলিশের গাড়িতে তুলল তারা। ষণ্ডামার্কা লোকটা বাঁধা হাতে আস্ফালন করতে করতে গাড়িতে উঠল —শালাশুয়ারকি—। হিন্দুস্থানের বাজারে সর্বভারতের গ্রহণীয় বাংলার কী মাল জোর বিকোয় যদি আমায় জিগোস করে কেউ, তার উত্তরে বলব,—শালা! প্রমাণ আছে বিস্তর—
পুলিশের গাড়ি চলে যেতেই লাফিয়ে উঠল দরবেশরা। দুই নম্বর ড্রাইভার এবার চাকার সামনে বসল। নৌকার মত দুলে দুলে অতি ধীর গতিতে বুড়ো বাস্ চলল মথুরার পথে। বৈষ্ণবদের দেহ সৌরভে গাড়ির পোড়া মবিলের দৌরাত্ম্যে চমৎকার পরিবেশ ভিতরে। ওভার কোট খুলেও ঘামে নেয়ে উঠি—
সেকেন্দ্রায় আসতে না আসতেই আবার সেই গাড়ির আক্রমণ। আবার দরবেশরা নিচে নেমে মাটিতে বসে পানের ডিবে খুলল। পুলিশসাব আমাকে এসে পাকড়ায় এবার। সাক্ষী হতে হবে। নাম ধাম পেশা বলতে হবে এবার—
বেশ! কিন্তু পেশা কি বলবো আমি? আমার যে পেশা তা বর্তমান সমাজে বুক ফলিয়ে পাঁচজনের পাতে দেবার মতো তো আর নয়।

এদেশে পেশা বলতে দুটো; চাকরি আর বিজনেস। বাদবাকি সব নেশা। সুতরাং ফস্ করে বলে বসি,—বিজনেস্!

তাই কি আর রক্ষে আছে, গোটাকয়েক সই দিয়ে তবে খালাস। রক্ষে পেয়েছে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা। লেখাপড়ার বালাই নেই, সাক্ষী সাবুদ মানতে আসে না কেউ—

দুই নম্বর ড্রাইভার সাহেব বাঁধা হাতে গর্জন ছেড়ে 'শালা' বলতে বলতে এবার পুলিশের গাড়িতে উঠে শালার পিতৃগৃহে চলল বুঝি।

কন্‌ডাক্‌টর এবার চাকা হাতে নিয়ে বসেছে। বুঝলাম, আগে থেকেই তারা তিনজন চালকের ব্যবস্থা ঠিক করে রাখে এই জন্যে—

এই ক-মাইল পথ আসতে তিনঘণ্টা। আর মথুরায় পৌঁছেই কি শান্তি আছে? কোথায় যমুনায় সূর্যাস্ত দেখবো, না, পাণ্ডার দল ছেঁকে ধরেছে চারপাশ থেকে।

—লেকিন কৃষ্ণজীকা জন্মস্থান জরুর দেখনে পড়েগা!—যেন গায়ের জোরে ধরে নিয়ে যাবে আমাকে।

শেষে রুদ্রমূর্তি ধরতে হল। ওরাও পেছ পা নয়! হেড্ পাণ্ডা মুখিয়ে উঠল,—বাঙালী বাবু লোকই ওই রকম। যাও, আচ্ছাসে মোকান দেখো—

কিছু মনে করো না, সত্যি কথাই বলি। ভারতের তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডার আর শাখা মৃগের জ্বালায় স্বস্তিতে শ্বাস ফেলতে পাবে না তুমি—

এগারো

ফিরবার সময় আচ্ছা এক ঝামেলায় পড়া গেল। টুণ্ডলা স্টেশনে দিব্যি ফাঁকা গাড়িতে আসন বিছিয়ে বসেছি। হঠাৎ এক গাদা লোক উঠে পড়ল। ভিড়। গাড়ির মেঝেতে পর্যন্ত আসন বিছিয়ে বসেছে লোক। মিশ্র ভাষার কলরব চরমে উঠেছে। গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে এলো—

আর ঠিক তখুনি দরজার কাছে চেঁচামেচি। ব্যস্ত হাঁকাহাকি। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই চক্ষুস্থির। বাল্মিকী! বিরাট জোয়ান এক সাধু মহারাজ। গাঢ় শ্যামবর্ণ রুক্ষ গায়ের চামড়া, রুপালী লম্বা চুলের গোছা মস্ত মাথার চারপাশে এলোমেলো ছড়ানো। পাকা সুদীর্ঘ দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখমণ্ডল। মোটা নাক। আর লাল দুই চোখে উগ্র বিরক্তিমাখা তীব্র দৃষ্টি। পরনে গেরুয়া কাপড়, দুই বগলের ফাঁকে জড়িয়ে বাঁধা একখণ্ড পাতলা গেরুয়া কাপড়ের টুকরো। মস্ত মোটা মোটা সমর্থ দুটো হাত ও চওড়া কালো পিঠ অনাবৃত। খালি পা। বগলে কালো কম্বলে জড়ানো মাঝারি আকারের এক বিছানা। এমন অসাধারণ শক্তিধর ও আকর্ষণীয় চেহারার বুড়োবয়েসী সাধু এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

বাল্মিকী! আমি মুগ্ধ চোখে সেই বিরাট পুরুষের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু সে শুধু কয়টি মুহূর্ত। পাকা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে তাঁর ঠোঁট নড়ল এবার। গম্‌গমে গলায় সারা গাড়ি কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি,—

—বসতে দিতে হবেতো আমাকে? এঁ্যা,—হঠ্‌ যাও, ইধার হঠ্‌ যাও—

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল অনেকে। আমার বেঞ্চের শেষ প্রান্তে দেয়ালে

ঠেস্ দিয়ে বাল্মিকী পা ছড়িয়ে বসলেন। কিনারেই রাখলেন কম্বলে জড়ানো বিছানা। গার্ড বাঁশী বাজাল—

—এ্যাই দেওকী পরসাদ, এ্যাই বেটা, মেরা রূপেয়া—বাল্মিকীর চোখের উগ্রদৃষ্টি জানলার বাইরে কাউকে ধাওয়া করল। দরাজ গমগমে গলার স্বর সবাইর কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ত্বরিত পায়ে ছুটে এসে ছোটখাট একটি লোক গাড়ির ভিতরে ঢুকল।—হ্যাঁ মহারাজ, একটু জল খেতে গিয়েছিলাম—

এরপর লোকটা আমাদের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত সুরে বলে উঠল,—আপনারা দেখুন, মহারাজ চলেছেন প্রয়াগে। উনি টাকা ছোঁননা, আপনারা দয়া করে ওঁর এই টাকাগুলো কেউ রাখুন। ওঁর যখন দরকার হবে দেবেন, আর প্রয়াগে গিয়ে অন্য কারো হাতে এমনি গছিয়ে দেবেন—

অবাক হয়ে তাকাচ্ছি সবাই। বাল্মিকীর ওই বিরাট শক্তিশালী শরীর, উগ্র লাল চোখ। টাকা পয়সার সম্পর্কে নাক ঢোকাতে চাইছে না কেউ। তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। ততক্ষণে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। লোকটা ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—নিন্ কেউ টাকাটা—

আমিও দায় এড়াতে চোখ ফিরিয়ে চাইতে গিয়েই বাল্মিকীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। শান্ত চোখে মধুর হাসিতে বললেন তিনি,—রূপেয়া নাও বেটা, ভয় কিসের—

আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটা একটা আধ ছেঁড়া খাম আমার কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলে লাফ মেরে চলন্তি গাড়ি থেকে নেমে গেল—প্রণাম মহারাজজী।

অসহায় ভঙ্গিতে খামটা হাতে নিয়ে বোকার মত বাল্মিকীর ঘোর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলাম। গাড়িশুদ্ধ লোক আমার দুরবস্থা দেখে এবার প্রীতচোখে মুচকি মুচকি হাসছে শুধু—

আচ্ছা? প্রথমেই খামটা খুলে ফেললাম। এক টাকার নোট ছখানা

আর খুচরা দশ আনা।—ছটাকা দশ আনা, বাল্মি - থতমত খেয়ে চুপ্ করে গেলাম।

এ্যাঁ, কি বলছো বেটা!—চোস্ত হিন্দুস্থানীতে বলে উঠে লাল চোখ দুটি আমার শুকনো মুখে রাখলেন বাল্মিকী।

—হ্যাঁ মহারাজজী, ছটাকা দশ আনা আছে এতে!—সামলে নিয়ে বললাম।

—ঠিক হ্যায় বেটা!—দাড়ি গোঁফে ঝাঁকুনি দিলেন তিনি। মোটা সমর্থ হাত দুটি কোলের উপর রাখলেন। ওই দুই হাতে আমার মত অন্তত দশজন নওজোয়ানকে নিঃসন্দেহে ঘায়েল করতে পারবেন বাল্মিকী। হয়তো যখন রত্নাকর ছিলেন তাই করেছেন।

—ব্যাপার কি জান,—সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তার দিকেই। লাল চোখের তীক্ষ্ণ বিরক্ত দৃষ্টি ছিটিয়ে তিনি বললেন,—সন্ন্যাস নেবার পর থেকে তিনটি জিনিস আর ছুঁইনা—আগুন, টাকা আর স্ত্রীলোক। পথে ঘাটে চলতে তাই বিশ্বাস করতে হয় লোককে। মাঝে মাঝে দৈত্য দানা জোটে, পয়সা নিয়ে পালায়—

আমার বুক কেঁপে উঠল। টাকা পয়সার সম্পর্ক বড় খারাপ সম্পর্ক। ছটাকা দশ আনার শ্রাদ্ধ না জানি কতদূর গড়ায়—

—তা বেটা আমার, তোমার দেশ কোথায়? বাল্মিকী স্নেহের চোখে তাকিয়ে হাসলেন। হাসি? আগুন যদি বলে,—আমার কাছে এসো, ঠাণ্ডা হবে,—তাহলে যেমন আশ্বস্ত হওয়া যায়না, আমারও তাঁর উগ্র মুখের হাসি দেখে সেই দশা। ছটাকা দশ আনার বিপদের চিন্তায় মুষড়ে পড়েছি রীতিমত। চিরদিনই টাকা পয়সার সম্পর্কে আমার একটা ত্রাস, যদিও সন্ন্যাসী নই! শুকনো গলায় জানালাম,—আমি বাঙালী।

কিন্তু দুনিয়াতে অঘটন ঘটে চলেছে অবিরাম। এবারও ঘটল। বাল্মিকীর দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে ঘেরা প্রকাণ্ড মুখে ও লাল চোখে

নিঃসন্দেহে গভীর স্নেহ মমতার ঠাণ্ডা ছায়া ঘনিয়ে এলো। অবিশ্বাস্য পরিবর্তন! শান্ত সহানুভূতির চোখে আমার মুখে তাকিয়ে রইলেন কয়টি মুহূর্ত। হাসলেন বাল্মিকী,—পাগল ছেলে কোথাকার! চিনলি-নিরে! বাঙালী, আমিও যে বাঙালী, এ্যাঁ? আগেও আমতা আমতা করে তাই যেন বলতে যাচ্ছিলি, নারে দাদু!

নিমেষে যতো ভয় বাধা ধুয়ে মুছে গেল। নারকেলের বাইরের রুক্ষ চেহারা দেখে তবে বৃথাই এতক্ষণ বোকার মত ভয়ে মরছিলাম। তক্ষুনি সহজ অকপট হয়ে গেলাম আমি। মুখ জোড়া হাসি হেসে বললাম,—না দাদামশাই, আমতা আমতা করে বলতে যাচ্ছিলাম বাঙালী নয়, বাল্মিকী!

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বোমা ফাটল। গাড়ির চাকার শব্দ ছাপিয়ে বাল্মিকীর চল্লিশ ইঞ্চি বুকে আলোড়ন তুলে ফেটে পড়ল অভূতপূর্ব অট্টহাসি। অনেকেই সেই শব্দব্রহ্মের আঘাতে চমকে উঠল আচমকা। তাঁর দাড়ি গোঁফ সমেত মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে দ্রুত ঘুরছে। পটকা ফাটার শব্দে অট্টহাসি হাসলেন বাল্মিকী। লাল ভয়ঙ্কর চোখে জল ছুটেছে,—বা—ল্মি—কি, এ্যাঁ··· ·হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ······

সেই প্রাণ কাঁপানো হাসির আক্রমণে থ' মেরে বসে আছে গাড়িশুদ্ধ লোক। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাচ্ছে আমাদের দুজনের দিকেই।

অনেক পরিশ্রমে বাল্মিকী হাসি থামালেন। খাঁটি বাংলায় তার গম্‌গমে গলায় যেন মধু ঝরল,—ঠিক বলেছিস দাদু, এমনটি আর কেউ বলেনি কোনদিন, হয়তো ভয়েই! নে, একটা প্যাঁড়া খেয়ে ফেল—

বাঘের থাবার মত হাতটা নিমেষে ঢুকল কম্বল জড়ানো বিছানার ভিতরে। বেরিয়ে এল প্যাঁড়া আর কমলা লেবু নিয়ে।—নে পাগলা, খা! না খাবিতো দেখছিস হাতের গোছা, এ্যাঁ? বাল্মিকী, হাঃ হাঃ হাঃ·········

শুকনো নারকেলের সুকঠিন ছোবড়া সরিয়ে এবার মিষ্টি শাঁসের সন্ধান

পেয়েছি আমি। মন দুলে উঠল। বাল্মিকী খুশি মনে বলে যেতে লাগলেন একটানা,—

—তিন জায়গায় আমাদের আশ্রম। হৃষীকেশেই কাটাই বেশির ভাগ। জানিস দাদু, আজকাল টিকিট কাটি। আগে এমনিই রেলে চড়তাম। হিন্দুস্থানে রেল গাড়িতে সাধুদের টিকিট লাগে না। কোন আইনের বইয়ে লেখা না থাকলেও এই-ই নিয়ম। তবে মাঝে মাঝে রেলের লোকে জ্বালাতন করে। একবার কানপুর ইস্টিশানে ঘটল বিপদ। আমার গাড়িতে হঠাৎ গোটা কুড়ি সাধু উঠে পড়ল। পিছনে প্ল্যাটফর্মের আলাপ শুনতে পাচ্ছি দুই রেলের বাবুর।

—চলুন, সাধুবাবাজিদের ধরিগে! একটু পুণ্য করে আসি—

তাই এলো ওরা, বুঝলে দাদু। তোমার বয়েসী দুই সুন্দর চেহারার ছোকরা। সাধুদের নিয়ে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি, কিলাকিলি। শেষে সবাইকে নামিয়ে দিলে গাড়ি থেকে। কিন্তু আশ্চর্য, একটিবারও আমার দিকে এগোলনা। সেই কানমলা খেলাম। ঠাকুরকে বললাম, একি লজ্জায় ফেললে ঠাকুর! বুঝেছি, আর চুরি করে গাড়ি চড়বনা। সেই থেকে টিকিট করি, বুঝেছ দাদু—

বুঝেছি! কিন্তু বাল্মিকী ঠিক বুঝেননি। ঠাকুরের কৃপার দরুণ নয়, তার শালপ্রাংশু মহাভুজ ভীমাকৃতি চেহারা দেখেই রেল-বাবুরা তাঁকে ঘাঁটায়নি—

ভারতের ছোটবড় সব তীর্থেই ঘুরেছেন বাল্মিকী। অবিশ্রান্ত সেই গল্প চলতে লাগল—

এবার নির্ভয়ে আমি নারকেলের মিষ্টি শাঁস আর ঠাণ্ডা জল খাচ্ছি!

এর মাঝেই গণ্ডগোলটা লাগল। এক স্টেশনে দুই সৈনিক প্রবর এই গাড়িতে উঠলেন। উঠেই মিলিটারী-মেজাজে সবাইকে বকে-ঝকে অস্থির। তুমি সরে বসো, তোমার বিছানা এখানে কেন! তুমুল কাণ্ড।

সৈনিক দেখে কেউ ভয়ে টুঁ শব্দ করে না। তারা দুজনে রীতিমত অত্যাচার করে বেড়াতে লাগল চলন্ত গাড়ির ভিতরে—

সবাইকে মিলিটারী শাসনে কাবু করে তারা পাকড়াও করল বাল্মিকীকে। কম্বল জড়ানো বিছানাটায় রুলের গোঁতা মেরে হুংকার ছাড়ল,—এ্যাও সাধু, বিছানা নিচে নামাও, বেঞ্চে একজন বসতে পারবে—

বাল্মিকী এতক্ষণ আড়চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে চলেছিলেন দক্ষিণের সমুদ্রের কোল ঘেঁষে মহামল্লপুরমের রথের শোভা, কাঞ্চির মন্দিরের হৃদয়হরণ সৌন্দর্যের খুঁটিনাটি। এবার রক্তচক্ষু মেলে গোঁফদাড়ি ঝাঁকিয়ে জানালেন,—এ নামানো যাবেনা, পূজার সামগ্রী আছে এর ভিতরে—

—আরে সাধু, বুড্ঢা মহারাজ, এ নমুনা বহুৎ দেখেছি। চোরাই মাল আছে এর ভিতরে—

—চোপ্!—গম্ভীর মুখে বাল্মিকী বাঁ হাতটা বিছানার উপর রাখলেন। সৈনিক রুলের খোঁচা মারল বিছানার উপর। অন্যজন আমার পায়ের উপর পা রেখে তম্বি শুরু করল,—এ্যাও সাধু, ভাল কথায় না শুনলে বিছানা ছুঁড়ে ফেলে দেব জানলা দিয়ে—

—বুঝলে বুড্ঢা মহারাজ,—অন্য সৈনিক প্রবর সাথীকে সমর্থন করে বাল্মিকীর গাটা একটু ঠেলে দিল।—গার্ডসাহেবকে ডাকলে চোরাই মালও বেরিয়ে পড়বে, আর বিনা টিকিটে—

কথা শেষ করতে না দিয়ে সিংহের মত কেশর ফুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন সত্তর বছরের বুড়ো সন্ন্যাসী। লাল চোখ দুটো জ্বলছে। লম্বা রূপালী দাড়িগোঁফ কেঁপে কেঁপে উঠছে। যেন সত্যযুগের রাজদরবারে অপমানিত কোন ঋষি, অভিশাপ দিতে উদ্যত—

নওজোয়ান সৈনিক দুজন এই বুড়োকে ভয় পাবে কেন? গাড়ির দেহাতী লোকগুলো ভয়ে স্তব্ধ, নির্বাক। সৈনিক আরেক গোঁতা লাগাল বিছানায়,—নামাও বিছানা, নইলে, নইলে বুড্ঢা—

কথা আর শেষ হলনা। অপমানিত ঋষি চোখের পলকে দুই পরাক্রান্ত নওজোয়ানকে দুই হাতে বগলদাবা করে প্রচণ্ড চাপ দিতে শুরু করেছেন। অপূর্ব দৃশ্য। প্রতিটি চাপের সঙ্গে কোঁ কোঁ করে চেঁচাচ্ছে বাচাধনেরা। অবশ হাত থেকে রুল ঝরে পড়েছে। বাল্মিকীর গোটা নাক ফুলে উঠেছে, দারুণ রোষে ফোঁস ফোঁস শ্বাস পড়ছে।

—পাপিষ্ঠ! তোমরা রক্ষক! শালা ভক্ষক কোথাকার! আউর কভি?

—কভি নেহি. মাফ কিজিয়ে! মহারাজজী—সামনে বগলের ফাঁকে সাঁড়াশি হাতের চাপ পড়ছে। বেশ কয়েক মিনিট পর হাত খুলে দিলেন তিনি। ধপাস্ করে অর্ধমৃতের মত সৈনিক প্রবররা নিচে পড়ে হাঁপাতে লাগল। বাল্মিকী বেঞ্চে বসে নিশ্চিন্ত মনে বিছানাটা ঝাড়তে লাগলেন। সৈনিকরা নিশ্চুপ। মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতন। সবাই নির্বাক। শুধু গুনগুনিয়ে এবার গান গাইছেন বাল্মিকী। সবাই ভীত বিস্ময়ে দেখছে তাকে। স্টেশনে গাড়ি থামতেই সৈনিকরা মাল পত্র নিয়ে মাথা নুইয়ে নিঃশব্দে নেমে গেল—

—দাও, চা!—বাল্মিকী সংক্ষিপ্ত আদেশ জানালেন।

চা ডাকলাম।

—তোমার জন্যেও, দাও!— আবার সংক্ষিপ্ত আদেশ। নিলাম। আমার পকেট থেকে পয়সা বের করতে যেতেই আবার হুংকার দিলেন বাল্মিকী,—সাবধান! আমার পয়সা থেকে দাও! সন্ন্যাসীর আইন ভাঙতে যেও না—

তাই ভাঙব আরকি! এই মাত্র যার বগলচাপার বহর দেখলাম! আমার সুললিত তনুদেহে একটি চাপও সইবেনা—

ছটাকা দশ আনার ভাণ্ডার থেকে চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখি গাড়ির সবাই ভক্তিপ্লুত চোখে টুপ্ টাপ্ বাল্মিকীর পায়ে প্রণাম করছে। চোখ বুঁজে কপাল কুঁচকে স্থির বসে আছেন তিনি।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই চোখ খুললেন। আমার মুখে তাকিয়ে স্নিগ্ধ শান্ত হাসি হাসলেন,—কিরে পাগলা! আর বাল্মিকী বলবি!

—না দাদা মশাই! এবার থেকে দুর্বাসা, যা দেখলাম—

—হাঃ হাঃ হাঃ,—আবার সেই বিকট বোমাফাটার শব্দে অশ্রুতপূর্ব অট্টহাসি।

—দুর্বাসা! শালা দাদু আমার দিব্যি রসিক, দেখতে ছোট্টটি হলে কি হয়, এ্যাঁ? হাঃ হাঃ হাঃ—

এরপর আবার শুরু হল গল্প। বদ্রীনাথের বরফঝরা পথে যাত্রার কাহিনী, কামাখ্যার পাহাড়ের চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক শোভা, তাঞ্জোরের আর রামেশ্বরমের মন্দিরের মহান শিল্প কলা।

গাড়ি এল এলাহাবাদ। টাকা নিয়ে কী করব ভাবছি। দুর্বাসা পিঠ চাপড়ে দিলেন,—চল্ দাদু, আমার আশ্রমেই চল্ এখন।

উঁহু, আমি মাথা নেড়ে চিন্তা করি।

হঠাৎ জানলায় হাসি মুখে হাত রাখল অধবয়েসী একজন। হাসল। এইযে মহারাজ! এসেছেন?

রক্ষা পেলাম। ওর হাতে দুর্বাসার কাঞ্চন জমা দিয়ে ছাড়া পেলাম। দুর্বাসা বারবার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

আর এখন পকেটে মোট এক আনা সম্বল। রিক্সায় উঠে সোজা সেবাশ্রম সংঘে এসে হাজির। পয়সা চেয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, আমারও টাকা এসে গেছে।

আঃ, এবার ফিরবো।

বার

লঙ্কায় যে যায় সে রাবণ হয় কিনা জানিনে, কিন্তু ট্রেনের কামরায় যে একবার ঢুকতে পেরেছে সে দুর্যোধন ছাড়া আর কিছু নয়। বাইরে থেকে ঢুকতে গেলেই নিজের নাজেহাল হবার কাহিনী ভুলে গিয়ে গর্জে উঠে, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী! ভর দুপুরে এলাহাবাদ স্টেশনে ট্রেনের এ-মাথা ও-মাথা ঘুরেও ঢুকতে পেলাম না। থার্ডক্লাস কামরা গুলির অবস্থা ভয়াবহ। ভিড়ের চাপে কাৎরাচ্ছে মানুষ। চড়ুই পাখিও দরজা দিয়ে গলাতে পারবে না। আর কি আরামেই না আছে আপার ক্লাসের রাজপুত্র রাজকন্যেরা। অনিন্দ্যমুখশ্রী। চোখে গগল্‌স। মুখে রঙ। জানলায় গলা বাড়িয়ে সখা সখীদের সঙ্গে বিদায় বাণী বিনিময় হচ্ছে হেসে হেসে। একটি গাড়িতে তিন চার জনের বেশি নেই। আহা রে। কিন্তু আমার যে ঠাঁই নেই কোথাও।

ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে। হঠাৎ জানলার পাশে একটি মুখ দেখে থমকে দাঁড়ালাম। অপূর্ব! ঠিক যেন ওরাং-ওটাং। আবলুশের মত কালো রঙ। মাথা জোড়া টাকের কিনারে কাঁচা পাকা চুলের বর্ডার। বাঁকাচোরা গোঁফ, গজদন্ত, ধ্যাবড়া বড়গর্ত নাক, ছোট্ট চোখ, কি নেই! দেখেই ভাল লাগল। লক্ষ্মৌর আশ্রয় নিকেতনের পাণ্ডাজীরও এমনি রূপ ছিল বাইরে। ফেরিওয়ালারা ত্রস্তে জানলায় জানলায় শেষবারের মত হেঁকে যাচ্ছে। ট্রেন ছাড়বে এক্ষুনি। কি খেয়াল হল, মরিয়া হয়ে গিয়ে বাংলায় বলে বসলাম,—ও দাদা যেতে দেবেন না নাকি?

এ্যাঁ? ওরাং ওটাং হাসলে। মুখ জোড়া পুলকের হাসি।

বাঙালী? আসুন আসুন, কি ভালই না হল। কদ্দুর যাবেন, কলকাতা? আহা, আরো ভালো। না, না, দরজা দিয়ে চেষ্টাই করবেন না, আসুন জানলা দিয়ে, আমি—

আর চিন্তা নয়। শ্যামের বাঁশী বাজল। থলিটা ভিতরে ছুঁড়ে

জানলায় হাত রেখে দাঁড়ালাম, পর মুহূর্তে মস্ত একজোড়া গেরিলার থাবা আমার দুইবগলে জাপটে ধরল, এর পর দেখি ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি। তক্ষুনি ট্রেন ছাড়ল।

ভিতরের দুর্যোধনরা রাজ্য হারানোর ভয়ে হাঁ হাঁ করে উঠল। দাদা চোস্ত হিন্দিতে সবিনয়ে জানালেন, টিকিট কেটে বেচারি পড়ে থাকবে? এইতো দাঁড়িয়ে আছে, কারো কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

দাদা চমৎকার মানুষ। একটু পরেই তাঁর পাশে আমার তনুদেহ বল্লরী রাখলাম।

যাই বলুন, দেশের মানুষ! দাদা গজদন্ত দেখিয়ে একমুখ হাসলেন। মাতৃভাষায় ছাড়া কথা বলে কি সুখ আছেরে ভাই। সেই যে বাল্যে পড়েছিলাম কি যেন, হ্যাঁ, বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা। খুশিতে তাঁর ছোট চোখ দুটো পিট্ পিট্ করতে থাকে। ধ্যাবড়া নাকের গর্ত দুটো কামানের মুখের মত উঁচিয়ে ধরেন তিনি। ওরাং ওটাং।

আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখি। হিন্দি প্রবাদে শুনেছি, ভগবান যাকে দেন তাকে চাল ফুঁড়ে দেন। এও তেমনি। যেমন মুখ, তেমনি কুৎসিৎ হাত পা, বিকটাকার ভুঁড়ি, লোমশ ভালুকের মত বুক।

কিন্তু ভিতরের রূপই কি তার কম? আলাপচারি হল। দিল্লীতে অতি সামান্য বেতনে কেরানীগিরি করেন বিনয়বাবু। থাকেন বিনয় নগরে। অতি বিনয়ী। মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে চলেছেন।

—কত চিন্তারে ভাই,—বিনয়নগরের অতি বিনয়ী বিনয়বাবু দাঁতের লাল মাড়ি দেখিয়ে হেসে আমার চোখে চোখে তাকান,—বাড়ি গেল পাকিস্তানে। না খেয়ে মারা যাবার জোগাড় হয়েছিল। বহু কষ্টে চাকরি পেলাম, তাও দিল্লী। যাদবপুরে মাথা গুঁজবার ঠাঁই করেছি একখানা, পরিবার রেখেছি সেখানে। তিন তিনটি মেয়ে বিয়ের যুগ্যি! গার্জেন ছাড়া ছেলেগুলো যেন 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্' পেয়েছে। পড়াশুনা নেই, সিনেমা দেখছে, বিড়ি ফুঁকছে। আমি বলি, নে ব্যাটারা,

তোদের কপাল তোদের হাতে। মেয়েদের বিয়ে দেওয়াটা আমার কর্তব্য, সেটা আমি সেরে যাব। এইতো দুটি মেয়ের একসাথে ঠিক করেছি, আসছে আঠাশে ফাল্গুনে। তোরা যদি সুযোগ পেয়েও না পড়িস ব্যাটারা, আমায় কি দোষে ধরবে, তুমিই বলোরে ভাই,—বিনয়বাবু আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন।

—ঠিকতো। খুব সত্যি,—আমি হেসে সায় দিই।

—হ্যাঁ, আমিও মানুষতো! তোরা ছেলে হয়ে বাপের দুঃখ বুঝলিনে। —তিনি মনের মত শ্রোতা পেয়ে ডুকরে উঠেন যেন। লাল মাড়ির ফাঁকে থুতু বৃষ্টি হতে থাকে অনবরত,—জীবন ভর খেটেখুটে যা করলাম, পাকিস্তানে আর আত্মীয়তে মিলে খেলে। এই বুড়ো বয়সে কেরানীগিরি করতে এসেছি এতদূরে! মধ্যবিত্ত আর বাঁচবেনারে ভাই,—কালো মোটা কুচ্ছিৎ লোকটা যেন দুঃখে কেঁদে ফেলবে,—আর বাঁচবে না। বেকারী, সিনেমা আর ভেজালে মিলে প্ল্যান করে হাড়মাস চিবিয়ে খাবে, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে, তবে ছেলেদের আমাদের চৈতন্য হবে। কি বলো, এ্যাঁ? ঠিক বলিনি?—

—ঠিক ঠিক।

একমনে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ ফুকরে উঠলেন দাদা আমা । তীব্র চোখে জ্বালিয়ে মারলেন আমাকে। কিছুদিন আগে দেড়শো টাকা পাঠিয়েছিলাম ছেলেদের কাছে। বাড়তি কাজ করে কামিয়েছিলাম, রক্ত জল করা টাকা। লিখলাম, ছোট্ট একটা ঠাকুর ঘর তৈরি করে নে। কুলদেবতা রাধামাধব আছেন আলমারির উপর তোলা! কি কেলেঙ্কারি বলতোরে ভাই। লিখলাম, হলো তোদের ঘর তোলা? রাধামাধবের দয়ায় টিকে আছি, হলো তার সেবা করবার ঠাঁই? শ্রীমানরা জানালেন, জানোরে ভাই,—ঝড়ে নাকি রান্নাঘর পড়ে গিয়েছে, সেটা মেরামতে সব টাকা চলে গেছে! বাজে একটা খবর দিয়ে দিল বাপধনেরা, বুঝেও চুপ করে রইলাম। টাকাটা সিনেমায় আর

...তমর স্টলেই গেছে। কপাল গুণে ঠগের পাল্লায় পড়েছি। এও আমার সেই মণিঅর্ডারে দই পাঠানোর বিত্তান্তরে ভাই, হেঁ—

—মণিঅর্ডারে দই ?—অবাক মানি।—সেটা কি ব্যাপার ?

—আর ভাই, তাও জানোনা ?—দাদা লালচে গজদন্ত দেখিয়ে খুশির হাসি হাসেন।—আহা, জানোনা বুঝি ? আমাদের ওদিকের গল্প একটা। আধা গাঁ জায়গা। এক ঘোষ রোজ পোস্টাপিসের সামনে দিয়ে যায়। দেখে, লোকজন টাকাকড়ি খাবার-দাবার কাপড়-চোপড় এখানে ওখানে পাঠাচ্ছে। দেখে আর ভাবে আমারো কি কোথাও কিছু পাঠাবার ভাগ্য হবেনা কোনদিন ! একদিন রে ভাই তারও সুযোগ এল। সাত মাইল দূরে এক বিয়ে বাড়ি পাঁচ সের দই পাঠাবার অর্ডার এল। ভাল করে দই পেতে বড় পাতিল নিয়ে পোস্টাফিসে হাজির হল সে। বললে মাস্টার বাবুকে, বাবুমশয়, এই দইটা মণিঅর্ডার করে রায় বাবুদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। কত লাগবে ?—দশ আনা, বাবু বললেন। —বেশ ! নিশ্চিন্তে ঘোষ তো বাড়ি চলে এল। বেজায় খুশি। মণিঅর্ডারে দই পাঠাতে পেরেছে এতদিনে, বাবুর জাতে উঠেছে। এদিকে পরদিন রায়বাড়ি থেকে গরম নালিশ এসে হাজির। কোথায় দই ? হন্ত দন্ত হয়ে বেঁচারি ঘোষ পোস্টমাস্টারের কাছে দৌড়ল। দই পৌঁছলনা কেন ? মাস্টার গোঁফের তলায় মিষ্টি করে হাসল। ওর পিঠ চাপড়ে দিল। দইর ঢেকুর উঠছে তখনো তাব। বললে,—আর বলোনা ঘোষের ব্যাটা ! কাণ্ড আর কি ! এই যে দেখছো মাঠের উপর দিয়ে তার চলে গেছে, সেই তার বেয়ে মণিঅর্ডারে তোমার দইএর পাতিল চলেছিল রায় বাড়িতে। এমন সময় ওদিক থেকে ঐ তার বেয়ে মণিঅর্ডারে শহরে আসছিল এক বুড়ো হাকিমবাবুর লাঠি। দুটোতে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল মাঝ পথে। বুঝতেই পারছো ঘোষের বেটা কাণ্ডখানা ! কি করবে ! সবই মহামায়ার ইচ্ছা, তারা ! তারা !— বটে ! দাদা দেখছি রসিক ব্যক্তিও বটেন !

কিছুক্ষণ চুপচাপ। শিখ, দেশোয়ালী, বাঙালী পাঞ্জাবি যাত্রীর মিশ্রিত কলরব আর ট্রেনের গুম্ গুম্ শব্দ। হঠাৎ আবার বিনয়বাবু ফুঁকরে উঠেন,—কিন্তু আমি মরলাম রে ভাই!

—কেন?—তাঁর কাচুমাচু মুখের দিকে সভয়ে তাকাই আমি।

—আর বলো কেনরে ভাই লজ্জার কথা!—ইতস্তত করেন ভদ্রলোক।

—বাথরুমে যাবার জন্যে প্রাণ যায় যায় কয় ঘণ্টা ধরে। জানলা দিয়ে এই বপু দিয়ে তো আর যেতে পারি না—

—নিশ্চয়! জানলা দিয়ে যাবেন কেন? বাথরুম নেই ওদিকে?—

—থাকবেনা কেন, আছে! ভিতরে তিন তিনটি লোক ভিড়ের ধাক্কায় দাঁড়িয়েছিল এলাহাবাদ পর্যন্ত।—তিনি ফিসফিসিয়ে উঠেন সন্ত্রস্ত গলায়, —কিন্তু দরজার মুখে বসেছে এক বেটী,—সুন্দরী! ওর বসবার জায়গা নিয়ে এক ব্যাটা শিখ আর দেশোয়ালীতে মিলে কুরুক্ষেত্র লাগিয়েছিল। সুন্দরী শালী! বুড়ো বয়েসরে ভাই, হাঙ্গামা আর ভাল লাগেনা—

তাই বলে বাথরুমে যাবেনা কেউ? এ কেমন কথা,—আমি অবাক মানি।

—বুঝলেরে ভাই, শুনে রাখো, অনেক দেখলাম এ জীবনে।—আগের কথার জের টেনে তিনি বলতে থাকেন,—দুনিয়ার যত তাজ্জব কাণ্ড সব ঐ মেয়েদের নিয়ে। ওদের কাছ থেকে তিন হাত তফাতে থাকবে সব সময়। এঃ, শিখ বেটার কপাল ফেটে গেছে লড়াইয়ে,—উত্তেজনায় চোখ মুখ গোলাকার হয়ে উঠে তাঁর।

কত যুক্তি, কত অনুরোধ। বাথরুমে যাবেন না তিনি।—ও বেটীর ধার ঘেঁষবোনারে ভাই,—যা দেখেছি,—শালী সুন্দরী!

ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারলে পাকিস্তানে সর্ব্বস্ব খুইয়ে এসে বিনয়বাবুকে দিল্লীতে কলম পিষতে হতোনা। তাই ভদ্রলোক শরীরকে নানান ভঙ্গিতে মোচড় দিয়ে এতক্ষণে ছটফট করতে শুরু করেছেন। ওর জ্বালা যন্ত্রণা দেখে হাসিও পেল, করুণাও হল। দরজার কাছে বসা

গার্ডক্লাস ট্রেনের ছেলেদের রূপরাশি দেখে আসতে সাধ জাগল একবার। সামলে নিলাম। অনবরত ছটফট করছে কিম্ভুতকিমাকার লোকটা। ওরদিকে মুখ ফিরিয়ে বসলাম এবার!

বেনারসে গাড়ি ভাল করে না থামতেই জানলা গলিয়ে বিচিত্র কায়দায় লাফ দিয়েছে সে। মনে হল, যেন ভ্রমণ ওজনের তুলোর বস্তা ঠেলে ধপাস্ করে নিচে ফেললে কেউ। সঙ্গে সঙ্গে সে উধাও। হাজির হল মিনিট দশেক পরে, কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতে মুছতে। মুখে তৃপ্তির আলো, চোখে রোগমুক্তির খুশি।

—আঃ, বাঁচলামরে ভাই! দাওতো দেখি ঘটিটা; হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই বেঞ্চির তলায়—

দিলাম! ঝকঝকে তকতকে কাঁসার ঘটি।

গাড়ি ছাড়বার খানিক আগে হন্ত দন্ত হয়ে আধ ঘটি ভর্তি চা নিয়ে এসে হাজির হোঁৎকা লোকটি।—ধরোতোরে ভাই, ঘটিটি ভিতরে রাখো, আমি জানলা দিয়ে উঠি—

—জানলা দিয়ে!—আমার স্বরে বুঝি সংশয় বিস্ময় সব একসঙ্গে ফুটে উঠে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানলা দিয়ে! সোজা বাংলা কথা। আরবী ফার্সী কিস্সু নয়। দরাগত গার্ডের দিকে তাকিয়ে আত্মীয়বোধে মুখ ঝামটা মারেন তিনি।

তারপর শুরু হল কসরত। সার্কাসের খেলাকেও হারমানিয়ে দেয়। জানলা বেয়ে দুহাত উঠেতো আড়াইমণি বস্তা তিন হাত পিছলে পড়ে। গার্ড বাঁশী বাজিয়েছে। লাল মাড়ি বের করে প্রাণপণে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন কিম্ভুত লোকটি।

ধরো, শীগগির ধরো আমার হাত—

দরজাটা থাকতে, ভিড় নেইতো এখন—

চুপ! চুপ বলছি! তাঁর চোখ জ্বলে উঠল, যা বলছি করো, হাত পাকড়ো, গাড়ি ছোড় দেতা।

আর হাত পাকড়ো! লোমশ মোটা কালো কর্কশ হাত। কম্পমান গাড়ির ভিতরে হেঁইয়ো টান মারতে থাকি আমি তার দুহাত ধরে। গাড়ির ভিতরের লোকগুলো মহা আনন্দে বিনি পয়সার সার্কাস দেখছে যেন। সব কটার দন্তপাটি বেরিয়ে পড়েছে খুশিতে। হত-ভাগার দল!- গর্জাচ্ছে লোকটা।

—কিহে ছোকরা তুমি! তাকৎ নেই? ধরে টানো না হাত দুটো—

আর টানবো! একশো পাউণ্ডের শরীর দিয়ে ওই আড়াই-মণি মাংসপিণ্ড টেনে তোলা নতুন কোন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছাড়া আর কারো সাধ্য নয়। তবুও দাঁত কিড় মিড় করে আপ্রাণ টান দিলাম—হেঁইয়ো—হেঁইয়ো—

ফল হলো কিছুটা। কিন্তু বিশালাকার থলথলে ভুঁড়ি এসে আটকে রইল জানলায়। সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন ছাড়ল। ঝুলন্ত অবস্থায় হাউমাউ করে উঠল বেচারি। প্রমাদ গণলাম। ততক্ষণে এক শিখ সর্দারজীর হুঁস হয়েছে। হাসি থামিয়ে এগোল সে। তোমাকে একটু মদৎ করতে হবে দেখছি। দুজনে দুহাতে ধরে প্রচণ্ড টান দিতেই ওরাং ওটাং-এর মতই সে ভিতরে লাফিয়ে পড়ল ঝুপ করে—

—দরজা খোলা থাকতে এ- কোন দেশী পাগলামি.—সবাই তিরস্কারে মুখর হয়ে উঠল।

—বাপ্ রে!---হাঁপাতে হাঁপাতে বেঞ্চিতে বসে জিব বের করলেন বিনয় নগরের বিনয়ী বিনয়বাবু। কারো উপদেশ বাক্যে কান না দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে থেমে থেমে বললেন.—বাইরে থেকে দেখেছি বেটী বসে আছে এখনো! হুম্! ইতিহাসতো পড়নিরে বাবা, কতদেশ, কত সোনার সংসার, সব ছারখার হয়ে গেল। হ্যাঁ, নারীর কাছ থেকে শত হাত তফাৎ থাকবে সর্বদা। বলাতো যায় না, বড় সাংঘাতিক জিনিস শাস্ত্র কাররাই বলে গেছেন।—তাইতো আমার মেয়েদের এ্যাইসা কড়া শাসনে রেখেছি, হুঁ—

গাড়ির সবাই তখনো আমার টানাটানি নিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। হাস্থক—

এইবার চায়ের পালা। আধ ঘটি গরম চা থেকে সুবাসিত বাষ্প উঠছে। ভদ্রলোক এবার থলি খুলে পুরানো রংচটা বালির কৌটা বের করলেন একটা। ভিতর থেকে বেরোল স্যাঁৎস্যেঁতে বিঁটকেল গন্ধ—সেঁকা রুটি, গুড়। নীরবে একখানা রুটি আর গুড় আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন তিনি—

—ধরো, নাও দেখি ভাই।

—মাপ করবেন, মোটেই খিদে নেই,—রুটির চেহারা দেখে ঘাবড়ে যাই রীতিমত।

তিনি নাছোড়বান্দা।—না খেলে মনে করবো রাগ করে আছোরে ভাই। কত কড়া কথা বলেছি তোমাকে। বোঝতরে ভাই, মধ্যবিত্তের আজ মাথা ঠিক থাকবার নয়! এ্যাঁ?

না খেয়ে ছাড়া পাবার যো নেই। ছোট কাপ বের হল। চা খেলাম। তিনি ঘটিতে করেই কাজ সারলেন।

মোগলসরাই এসে বিস্তর লোক নামল। কিন্তু দরজার পাশের হেলেন নামেনি। সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে হতাশভাবে টেকো মাথা নাড়লেন তিনি।

—না, বেটী নামবে না, জ্বালিয়ে খাবে। আমি, বুঝলেরে ভাই, আমার মেয়েদের এ্যাইসা কড়া শাসনে রেখেছি, হ্যাঁ,—তার ছোট চোখ দুটি আত্মগরিমায় চকচক করতে থাকে—

গাড়ি ফাঁকা হতেই হঠাৎ মাথার উপরের বাঙ্কে একটা জাগরণের শব্দ শুনা গেল। ঝুপ করে নিচে নামলেন এবার আরেকজন। নাদুস-নুদুস চেহারা, সুবেশ সু-পুরুষ, ফর্সা গায়ের রং। একমাথা কোঁকড়ানো কালো চুল। চশমার আড়ালে বুদ্ধিদীপ্ত হাসিখুশি এক কালো চোখ।

বয়েসে তরুণ।

—নমস্কার,—সে হাসল,—এতক্ষণ নিচে নামবার ভরসা পাইনি ভিড়ের ভয়ে। কাশ্মীর থেকে আসছি কিনা! ঘুমিয়ে না গেলে উপায় আছে?

মুখোমুখি বেঞ্চিতে সে বসল এবার। আলাপচারি হল। অমলগুপ্ত. ছাত্র। বেড়াতে গিয়েছিল কাশ্মীর। সদালাপী, ফূর্তিবাজ, চমৎকার উৎসাহী ছেলে। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে সে ধাবমান বাবুর্চিকে হাঁক দিলে,—এ্যাই, পাটনামে খানা দেও!—এরপর আমার দিকে চেয়ে,—আপনি খাবেন না?

—না, সন্ধ্যারাতে খেতে পারিনা আমি, পরে দেখা যাবে—

সেঁকা রুটি চিবোতে চিবোতে গোলচোখে ওরাংওটাং আমাদের মুখে একঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে চা গিলতে থাকে—ঠাণ্ডা জল চা—

—সারা রাত আর বিছানা থেকে নামছিনা, ঘুম না হলে,—কি বলেন, গুপ্ত বাঙ্কের উপরে বিছানার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল মিষ্টি করে।

—হ্যাঁ, ঠিক বলছেন,—আমিও সায় দিই!

তড়াক করে লাফিয়ে বাঙ্কে উঠে গেল সে।

পাটনায় গাড়ি থামল। হেলেন সদলবলে নামল। মস্ত লোমশ বুকে হাত বুলিয়ে গজদন্ত বিকশিত করে হুস্‌হুস্ করে ওরাংওটাং স্বস্তির শ্বাস ফেলতে থাকে।

—বাব্বারে। এবার শান্তিতে কথা-টথা বলবোবে ভাই, বেটী নামল! মেয়ে লোক বড় সাংঘাতিক চীজরে ভাই। সর্বদা শত হাত তফাতে—

মুখের কথা মুখেই রইল। মুখ হাঁ করে ভীত বিস্ময়ে বাইরে তাকালেন তিনি।

—হ্যাঁ, এইটায় উঠে পড়, চটপট,—বলতে বলতে এক ভদ্রলোক উঠে এলেন। পিছনে এক তরুণী আর হাফপ্যাণ্ট পরা এক কিশোর।

বাঙ্কের উপরটা একবার মচ্‌মচ্‌ করে উঠল। তরুণী আর কিশোর আমার মুখোমুখি বসল।

বাবুর্চি জানলায় নিবেদন করলে,—খানা সাব!

আমি লালচে ড্রাইভারি টুপীটা খুলে নিয়ে থলিতে ভরলাম। মাথায় চিরুণী তুললাম—

—ওঃ, ঠিক হ্যায়!—সুপুরুষ সুবেশ তরুণ বীরদর্পে নিচে লাফ দিল। জানলার পাশে বেঞ্চিতে বসে বীরের মত ভাত তরকারিকে বধ করতে উদ্যত হল। খানিকবাদেই আবার হাঁক ছাড়ল,—এ্যাই, ভাত কমতি হ্যায়!—

বাঁশী বাজতেই তরুণীর সঙ্গের ভদ্রলোক নিচে নেমে গেলেন,—পৌঁছে একটা চিঠি দিস্—

সে আর ছেলেটা জানলার বাইরে মাথা বের করে হাত নাড়তে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি প্ল্যাটফর্ম না ছাড়ল—

বিনয়বাবুর দিকে তাকালাম। হতাশ একটা মুখভঙ্গি করে সামনের খালি বাঙ্কে উঠে পড়লেন তিনি। ঠিক যেন চিড়িয়াখানার খাঁচায় ওরাংওটাং। গাড়ি প্রায় ফাঁকা। ওদিকে জানলার পাশে একটি সাধারণ বিহারী লোক বেঞ্চে পা তুলে মাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। এদিকে আমি। গুপ্তভায়া ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন ছারপোকায় ছেঁকে ধরেছে তাকে। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠল জানলার পাশ থেকে।

—ও দাদা, আমি তো অনেক ঘুমিয়েছি, এবার আপনি বাঙ্কে উঠুন, কেমন?

কাল বিলম্ব না করে মাথা নাড়লাম। আঃ, কতদিন এমন নরম বিছানায় শুইনি। ঘাড় কাৎ করে নিচে তাকাই। আমার ছেড়ে আসা বেঞ্চে মেয়েটির মুখোমুখি পায়ের উপর পা তুলে বসেছে গুপ্ত, সিগারেট ফুঁকছে নিখুঁত ভঙ্গিতে। ও পাশের বাঙ্ক থেকে পিটপিট করে তাকাচ্ছে নারী-বিদ্বেষী বিনয়বাবু। বিচিত্র মুখভঙ্গি করলে সে।

হঠাৎ নিচে থেকে আলাপের রেশ ভেসে এল। বই খুলে বসেছে মেয়েটি। ছেলেটার হাতে রঙিন বই একটি, আর গুপ্ত ভায়া ঝুঁকে পড়ে কী বলছে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সে,—ও দাদা, আমার স্যুটকেশটা দিনতো—

পায়ের কাছ থেকে স্যুটকেশটা দিলাম। সে নিচে সওদা খুলে বসল কাবুলিওয়ালার মতন।

—এই যে দেখুন, খাঁটি-কাশ্মীরি শাল, মাসিমার জন্যে এখানা। আর এখানা মায়ের, চমৎকার, না? এই দেখুন ফটো—হ্যাঁ, ঝিলমের বুকেই তুলেছি,—একটার পর একটা ফটো তুলে ধরে সে পরম উৎসাহে ব্যাখ্যা করে যেতে থাকে।

কনুইয়ে মাথা রেখে আমি ওদের লক্ষ্য করে চলি। মেয়েটির বয়েস কুড়ি একুশ। চমৎকার চুল। মাথার পিছনে নিপুণ কবরীতে সাদা চন্দ্রমল্লিকার শোভা। বাতির আলোয় চকচক্ করছে। ঝকঝকে ফসা নয়, কিন্তু কেমন এক সবুজ শান্ত ছায়ায় রমণীয় ওর তনু দেহ। উদার দিগ্বলয়ের আলোর মতন। বুদ্ধিতে শানানো ঝকঝকে চোখ, ধারালো নাক। আটপৌরে শাড়িতে ওকে মানিয়েছে আরো চমৎকার—

সঙ্গের ছেলেটি নিতান্তই শিশু। বছর বার বয়েস, চোখে মুখে জ্বলন্ত উৎসাহ নিয়ে ফটো দেখছে সে। প্রশ্নে প্রশ্নে গুপ্তকে ঘায়েল করছে—

হঠাৎ তরুণী চোখ তুলে তাকাল। মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়লাম। খিদে পেয়েছে এতক্ষণে। চোখ বুঁজে পড়ে থাকি।

ঘাড়ে মৃদু টোকা খেয়ে তন্দ্রা ভাঙল। একি! মাথার পাশে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি দাঁড়িয়ে।—না খেয়েই ঘুমুলেন? একটু খেয়ে নিন।—

—বাঃ, কে বললে খাইনি,—সখন বুঝতে পারলাম স্বপ্ন নয়, তাড়াতাড়ি সপ্রতিভ জবাব দিলাম।

—দেখলাম তো! উনি দিব্যি চেয়ে চিন্তে খেয়েছেন। গুপ্ত-ভায়ার

দিকে মৃদু হাস্যে ইঙ্গিত। তার দিকে তাকাতেই চশমার আড়ালে জ্বলন্ত একজোড়া চোখের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগল দৃষ্টির।

—আমি মোগল সরাইয়ে খেয়েছি—

—মিছে কথা!—সে গলায় ঝংকার তুলে শাসিয়ে উঠল,—

—মুখ দেখে কে খেল আর না খেল তাও বুঝতে পারিনা? নিন্, খাঁটি ঘিয়ের খাবার, ভয় করবেন না,—টিফিন কেরিয়ারের একবাটি ভর্তি খাবার বাক্সের উপর রাখল সে!—খান্! তার স্বর মেজর জেনারেলের হুকুমের মত শোনাল। আঃ, কি সুগন্ধ! পেটের ভিতর নাড়ি ভুঁড়ি এই সৌরভে যেন লাফিয়ে উঠে।

আমি আরামে আঘ্রাণ নিলাম —

—আমিও তো খাইনি কিছু,—সেঁকা রুটির কৌটো সামলিয়ে সহসা বাক্স থেকে ঘড়ঘড়ে গলায় নারী-বিদ্বেষী ওরাং ওটাং বলে উঠল। বেচারি আর খাঁটি-ঘি-এর পাটনাই খাবারের সুবাস সহ্য করতে পারেনি। লাল মাড়ি দেখিয়ে সে জিব বের করলে। হতভাগা—

—ঠিক আছে, এতো আমি খেতে পারছি কই। আসুন, ভাগ করে খাই।—আমি ব্যস্ত সুরে বলে উঠি।

—না, না, ও আপনি খান। সঙ্গে প্রচুর আছে, ওঁকে দিচ্ছি আমি। সাদাসিধে শ্রীমতী মেয়েটি কিম্ভুত কিমাকার লোভী ওরাং ওটাং-এর সামনে শীতের রাত্রে উঠে দাঁড়াল, যেন অসুরের সামনে সুধাভাণ্ড হাতে উর্বশী—

লোভী জিব বের করে সে লোলুপ হাত বাড়াল—

—পান।—আবার শ্রীমতীর শান্ত মুখশ্রী চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এবারও স্বপ্ন নয়।—দেখুন তো, কেমন খিদে চেপে শুয়ে পড়েছিলেন,—তার চোখে মুখে তিরস্কারের ছাপ।

—দেখুন, ঘরে বাইরে যখনি চলি আমার আশে পাশে অজস্র গার্জেন এসে জোটেন। এটা খাও, ওটা পরো।—আমি হালকা সুরে হেসে বলে উঠি,—তাই আমি আর খাওয়া পরা নিয়ে মাথা ঘামাই নে। খিদে পেলেই শুধু পাগল হয়ে ছুটি আর কি!—একটু তরল কণ্ঠে হাসলাম,—আপনার মত অনেক মেয়ে পুরুষ আমার সারা পথচলায় আমাকে যত্নআত্তি করে খাইয়েছেন, জানেন?

—তা আর জানিনে?—তার চোখে মুখে অসহায়কে বুঝে নিয়ে আশ্রয় দেবার আলো। আত্ম-গৌরবের আলো। যা মেয়েদের মুখেই দেখা যায়। আর যে মেয়ের চোখে মুখে অবুঝ মানুষকে খাইয়ে তৃপ্তির ছটা খেলে যায় না, সে দানবী। মানবী নয়।

—আমি একটা পান পাইনা?—চমকে নিচে তাকালাম। শীতে বেঞ্চিতে বসেছে গুপ্তভায়া। নিরাশ দৃষ্টি ওর চোখে মুখে। খেলায় হেরে যাওয়া ছোট্ট ছেলের মতন।

—নিশ্চয়ই।—শ্রীমতী মেয়ে মাথা নাড়ে।

—এতো বই কিসের?—বেঞ্চে ছড়ানো বইএর স্তূপের দিকে ইশারা করি আমি।—দু একটা দেখিতো—

—পড়ুন শুয়ে শুয়ে।—সে একটা বই তুলে দিল আমার প্রসারিত হাতে।

শেষের কবিতা। উল্টে-পাল্টে-দেখে নিয়ে বললাম,—ওঃ, বহুবার পড়া হয়ে গেছে।

—উঁ?—মেয়েটি চোখ তুলে তাকালে।—তাই বলে পুরোনো হয়ে গেল? পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু কি নেই যা বারবার দেখেও চির নতুন থেকে যায়, তৃপ্তি আসেনা? সাধ মেটেনা? এ বইএর বেলাও তেমনি—

গুপ্তভায়া তার অস্তিত্ব জাহির করতে প্রসঙ্গটা লুফে নিল।—ঠিক্,

ঠিক্! তুলনা নেই এই বইর। সেই যে কবিতা—"মোর লাগি করিয়োনা শোক—হে বন্ধু বিদায়!" আহা, মনে হয় যেন—

—শেষের কবিতার দেশ দেখতে কি যে সাধ আমার!—মেয়েটি বলে, স্বপ্নে দেখি প্রায়ই, পাহাড় ঝর্ণা আকাশ—আমি জবাব দিইনা!

গুপ্তভায়া তার অতি চালাকির ফল ভোগ করুক নিচের বেঞ্চে বসে বসে। শরীরের সমস্ত গ্রন্থি আলগা করে দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে সীমাহীন আরামে চোখ বুজলাম—আঃ! বিছানাটা কি আরামের!

আরাম! আরাম! আরাম!

স্বপ্ন নয়, কোন ব্যাঘাত নয়, টিট্টি বাবুদের অত্যাচার নয়, একটানা গাঢ় সোনালী ঘুমের অবসানে বর্ধমানে এসে ভোরে ঘুম ভাঙল। মিহিদানা সীতা ভোগের কোবাসের ফাঁকে ওপাশের বাঙ্ক থেকে হেঁড়ে গলায় সম্ভাষণ জানায় ওয়াং-ওটাং,—কেমন, ঘুম হল?—গজদন্ত বিকশিত করে সহাস্যে জানালে সে,—মেয়ে লোকটি নেমে গেল একটু আগে, ঘুমুচ্ছিলেন আপনি!

মেয়ে লোক!—ওঃ, সেই শান্ত সুষমার শ্রীমতী মেয়ে! হতভাগার কথার নমুনা শুনে গা জ্বলে গেল। লোভী জিব বের করে কাল রাত্তে খেয়েছিল কেমন পাটনাই খাবার! নিচে তাকালাম। গুম হয়ে বসে আছে সুশ্রী যুবক—গুপ্তভায়া। বিরহ শোকে, ব্যর্থ প্রয়াসে যেন পাথর হয়ে গেছে বেচারি।

—এবারে উপরে আসবেন?—শুধাই আমি।—ও চলে গেছে, না?

নীরবে মলিন ব্যথাতুর চোখে তাকিয়ে মাথা দোলায় গুপ্ত-ভায়া। বড় ভাল ছেলেটি। কী আরামেই না ঘুমিয়েছি রাত ভর। করুণায় মন ভরে উঠল। বাইরে ঝিকিমিকি সোনালী রোদে আকুল পাখি জেগেছে গাছের ডালে—পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা। এর জবাবে আরেক ডালে কোকিল গেয়ে উঠল—কুহু কুহু কুহু।—তবে আর ভয় কিসের। বসন্ত এলো বলে।

ভুড়-মুড়িয়ে লোক আসছেই। ডেলী প্যাসেঞ্জার মনে হচ্ছে। এর পর সেই চিরন্তনী ইতিহাস। ট্রেনের জমিদারী নিয়ে বহু মূল্যবান বাংলা-ইংরিজী কথার ফুলঝুরি। বাঙালীর মত জায়গা নিয়ে অমিত উৎসাহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইনিয়ে বিনিয়ে বিতর্ক চালাতে পারবেনা আর কোন জাতি। জিনীয়াসের জাত কিনা—

আসন করে নরম বিছানায় বসেই রইলাম। গাড়ি ছাড়ল। নিচের কলরব চরমে উঠেছে। এই কথার ফুলঝুরিতে বিন্যাস আছে, চাতুরি আছে, আত্মগরিমা আছে—প্রাণ নেই, জীবনের উত্তাপ নেই, অন্তরঙ্গতা নেই। ভাল লাগেনা—

একের পর এক স্টেশন আসছে। গাড়ি থামছে, লোক উঠছে,—ঝগড়া, চেঁচামেচি, ইতর গালাগালি। আর ভাল লাগেনা। বড় ক্লান্ত, বড় নিঃশেষিত—

চন্দননগর! চুড়িদার পাঞ্জাবি, গিলে করা ধুতি, শাল গায়ে পঞ্চাশোর্ধ বাবু উঠলেন। শৃগালের মত ধূর্তদৃষ্টি চোখে। উঁচু চেয়োল, বিতৃষ্ণায় ভরে গেল মন! হঠাৎ বাঙ্কে বসা ওরাং-ওটাংএর দিকে চোখ পড়তেই যেন বেজায় খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। মুখে একটা পান পুরে ওরাং-ওটাং-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলতে থাকেন তিনি। আমি কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাই,—আহাহা, তোমার ভাগ্যে এই ছিল হে বিনয়, ভাবতেই পারিনি! মেয়েটাকে খুঁজতে বেরিয়েছ বুঝি! বলো দেখি, আর কদিন পরে বিয়ে, আর পালালো কিনা এক ম্যাট্রিক ফেল ছোকরার সঙ্গে! ছিঃ ছিঃ, তোমার কথা ভেবেই কান্না পাচ্ছে আমার। এই নাটক-নভেল লিখিয়ে ব্যাটারাই ছেলে-মেয়েদের মাথাটা খেলে, কি বলো, এ্যা?

দীর্ঘ শোকোচ্ছ্বাসের অন্তে তৃপ্তিতে সিগারেট ধরালেন তিনি। আসন হয়ে বসা ওরাং-ওটাং-এর বিচিত্র মুখের দিকে তাকালেন। আমিও তাকালাম। জীবনে ভুলতে পাবব না সে কুৎসিত মুখের অসহ্য

যন্ত্রণা-বিকৃত অভিব্যক্তি। যেন জীবন্ত ওরাং ওটাং নয়, যাদু ঘরের নিষ্প্রাণ পুতুল ওরাং ওটাং নির্নিমেষে পাথরে মূর্তির মত চেয়ে আছে তার শুভার্থীর মুখে—নিশ্চল, নিঝুম, অচেতন।

সেই তার দিকে শেষ চেয়ে দেখা আমার। আর তার দিকে চোখ তুলিনি আমি।

গাড়ির গতি কমে আসছে। নিচে নামলাম। অদ্ভুত রকম গম্ভীর হয়ে গেছে হাসিখুশি সুন্দর ছেলেটা। গুম হয়ে থমথমে মুখ নিয়ে বসে আছে!

বলি,—এবার তো এসে গেলাম।

উ? গুপ্তভায়া নির্বোধের মত সচমকে তাকায়।

—এসে গেছি। বিছানা ঠিক করে নিতে হবে এবার।

ওর কোন চাঞ্চল্য নেই। গুম হয়ে বসেই থাকে সে। গাড়ি এসে ঢোকে হাওড়া স্টেশনে। হুড়-মুড়িয়ে লোকজন সব নেমে যায়। উপরের বাঙ্কে ওরাং ওটাংএর কোন সাড়া নেই। বজ্রাহত হয়ে বসে রয়েছে হয়তো হতভাগা লোকটি।

নমস্কার ভাই, চলি এবার!

গুপ্ত ভায়া গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। খস্ খস্ করে একটুকরো কাগজে নাম ঠিকানা লিখে বললেন,—শিবপুরে গেলে আমার বাড়ি যাবেন নিশ্চয়ই।

—নিশ্চয় ভাই।—আমি থলি হাতে দরজার বাইরে পা ফেলতে উদ্যত হই।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান,—বাঙ্কে বিছানা বাঁধতে গিয়ে ত্রস্তস্বরে ডেকে উঠে সে।

আমি ফিরে দাঁড়াই।

—আপনার বই! সে হাত বাড়িয়ে একটা বই আমার সামনে ধরে। শেষের কবিতা। হাতে নিলাম। এক মুহূর্তের জন্যে যেন বইয়ের

মলাটে একটি লাবণ্য মাখা শান্ত শ্রীমতী মেয়ের স্নেহ প্রীতি উদ্ভাসিত মুখখানি ভেসে উঠল। বইটা ওভার কোটের বিরাট পকেটে পুরে বাইরে এলাম।

বাসে চড়ে হাওড়ার পুলের উপর দিয়ে চলেছি কলকাতায়। গম্‌গম্ ছম্‌ছম্ শব্দ। লোহালক্কর ট্রাম বাস লোকজন। নিচে ঝিলিমিলি গঙ্গার অত্যাচার মলিন বুকে নৌকার স্টিমারের ছুটাছুটি। সকালের মিঠে বাতাসে রুখু চুল উড়ে উড়ে আমার কপালে গালে আদর জানাচ্ছে। বসন্ত এলো বলে। ভাবছিলাম ঃ

উত্তর ভারত দেখতে বেরিয়েছিলাম। কতটুকুই বা দেখলাম, কতটুকুই বা পেলাম। কিন্তু কী পাইনি, কী দেখিনি তা বড় কথা নয়। কী দেখলাম, কী পেলাম তাই আসল কথা। পেয়েছি হৃদয়ে হৃদয়ে স্বর্ণখণির সন্ধান মানুষের ভালবাসার বার্তা, পৃথিবীর বুকে সগৌরবে মানুষের মানুষ বলে বেঁচে থাকার সোনালী ভরসা— যে আমাকে একমুহূর্তের জন্যেও ভালবেসেছে, তার কাছেই আমি চিরকৃতজ্ঞ। কৃতঘ্নতা মানব মানসের জঘন্যতম অপরাধ। তারা কতজন নিতাই সিং, রাজভুখন, নীলমণি, পাণ্ডাজী, রাজীন্দর, মাইজী, ডাক্তার সাব, ওরাংওটাং, গুপ্তভায়া, আর—আর ওই শ্রীমতী চির অজানা মেয়ে, সব। সব আমার প্রিয় মানুষ হয়ে রইল। যাদের স্মৃতি আমার ঝড়ো মনে শান্তির আলো ছড়াবে।

আঃ, বুক জুড়ে কী নিবিড় ভালবাসা—এরা সবাই আমার! আমার। আমি সবার! এতো প্রাণ, এতো গান; এতো ভালবাসা। তবে আর জীবনে ভয় কিসের? তবে এবার আনন্দে তুমিও গান গেয়ে উঠো— কিসের ভয় কিসের হতাশা! কী বিচিত্র প্রাণের সমারোহ দেখে এলে তুমি—

পেলাম জীবনের বাঁচবার আশা—অহরহ মৃত্যুর তাণ্ডবে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে একমাত্র আশা। আশাই আমাদের অক্সিজেন! আরো দেখছি, মলিন বসন অশিক্ষিত মানুষ মাত্রই ঘৃণ্য জীব নয়। সোনা সোনাই, পাতালেই থাক, আর প্রাসাদেই থাক। তেমনি মানুষ মানুষই। সব সোনাই আর এমনি খাঁটি পাওয়া যায় না। বহু কষ্টে তার থেকে খাদ ময়লা কাদা ছাড়িয়ে নিতে হয়। যদি আমরা দোষটা ছাড়াতে জানি, তবে আগাছা মানুষই দেবশিশু হয়ে উঠবে। এ ভরসা পেলাম।

কিন্তু এবার যে বাড়ি ফিরবো! ডাক এসেছে মনে। আরো সাতশ' মাইল দূরে শিলঙের পাহাড়ে বসন্ত আসছে: নীলকান্ত মণির মত উজ্জ্বল গাঢ় নীল আকাশ, যেমনটি আর কোথাও দেখলাম না। চির সবুজ সুঠাম পাইনের বনে বনে উতলা হাওয়ায় হাওয়ায় পৃথিবীর জরাহীন যৌবনের মাতামাতির, হলদে একাশিয়া ফুলে-সমারোহ, প্লাম পীচ নাশপাতির ডালে ডালে সাদা ফুলের বাহার। মধুগন্ধা বাতাস। সেই আমার জানলার নিচে কলস্বরা পাহাড়ী নদীর কানে কানে গান, মাঠে মাঠে পাহাড়ের শান্ত দীর্ঘায়িত ছায়া, —আর কতদিন না দেখা কত প্রিয় মুখ—

কিন্তু দক্ষিণের বাতাস আমায় আকুল হাতছানি দেয় অহরহ। দক্ষিণ! দখিনা বাতাস আমায় আকুল হাতছানিতে ডাকছে, ঘরের আগল উড়িয়ে নিচ্ছে। হে দক্ষিণ, তোমার আকাশের তলায় আমার আগুন-জ্বলা প্রাণ জুড়াবে কবে? তোমার দাক্ষিণ্যে ধন্য করবে কবে?

শিলঙ

চৌদ্দই ফাল্গুন, ১৩৬২

১৪-২-৫৬ —২৭-২-৫৬ ই